# বিয়ের আগে

ফ্যান্টাসি নয়, হোক বাস্তব প্রস্তুতি

তানজীল আরেফীন আদনান
মানযুরুল কারিম

আবদুর রহমান (ছদ্মনাম) সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। এলাকায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করাই যেন তার প্রধান কাজ। বয়সও অল্প। তার উচ্চবিত্ত পরিবারে টাকা-পয়সার কোনো সমস্যা নেই। এসএসসির পর ফেসবুকে বিয়ে-বিষয়ক একটি গ্রুপে যুক্ত হয় সে। তাদের লেখাজোখা পড়ে বিয়ের জন্য পাগলপাড়া হয়ে যায়। বাবা-মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান অবশেষে জোর করেই যেন বিয়ে করে বসে। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার ভেতরকার পুরোনো স্বভাব আবার জেগে ওঠে। আবারও এলাকায় ঘোরাঘুরি, গেমিং নেশা, মেয়েদের সাথে আড্ডা ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে যখন স্ত্রীর প্রতি তার ফ্যান্টাসি কেটে যায় তখন আরেক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলাফল বিয়ের এক বছরের মাথায় বিবাহবিচ্ছেদ!

# বিয়ের আগে

তানজীল আরেফীন আদনান
মানযুরুল কারিম

নজরে সানী
শায়খ ইমদাদুল হক
দারুস সুন্নাহ, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উমেদ
প্রকাশ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

# কিছু কথা

একজন যুবক বা যুবতি যখন গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন দ্রুতই সে বুঝতে পারে, বিয়ে ছাড়া এই সমাজে গুনাহমুক্ত থাকা অসম্ভব-প্রায়। হাজারো তাওবা আর গুনাহত্যাগের প্রতিজ্ঞাকে চোখের সামনে বারেবার বাতিল হয়ে যেতে দেখে সে। গুনাহের মরুময় প্রান্তরে নিজেকে বড় অসহায় লাগে। প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যা-রাত তার এই উপলব্ধি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়—ঈমানের ওপর টিকে থাকতে বিয়েই করতে হবে। তার এই চিন্তা প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহে।

কিন্তু এই নেক চিন্তাটাই অনেক সময় ভুল পথে মোড় নেয়। বিয়ের আগ্রহ রূপ নেয় ফ্যান্টাসিতে। এটা একটা সমস্যা। এই ফ্যান্টাসি যার মাথায় ঢুকে যায় তার দিন-রাত একাকার হয়ে যায় বিয়ের চিন্তায়। অবিবেচকের মতো নানারকম অবাস্তব চিন্তা ও স্বপ্ন মাথায় ঘোরপাক খেতে থাকে। বিয়ে নিয়ে অলীক আশা-ভরসাও কাজ করতে থাকে, যার সাথে বাস্তবতার মিল নেই।

বিয়ের জন্য কিছু পূর্ব-প্রস্তুতি প্রয়োজন। বিয়েতে যেমন অনেক প্রাপ্তি আছে, তেমনই আছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য; যা পালনের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক মধুর হয়। আবার বিপরীত দিকে এই দায়িত্ব পালন না করায় সুখ-স্বপ্নে বিভোর হাজারো সংসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'বিয়ের আগে' সেই পূর্বপ্রস্তুতিরই পাঠ। আমরা বিশ্বাস করি, দায়িত্বশীল, বাস্তববাদী ও প্রোডাক্টিভ একটা প্রজন্ম গড়তে এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

শুকরিয়া জানাচ্ছি উভয় লেখকের, যারা অনেক শ্রম ব্যয় করে বইটি লিখেছেন। শায়খ ইমদাদুল হক (হাফি.) শত ব্যস্ততার মাঝে পুরো বইটি নজরে সানী করেছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও পরামর্শ দিয়েছেন। অন্তরের অন্তস্তল থেকে

তাঁর শুকরিয়া জানাই। উমেদ টিমের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা বিভিন্ন স্তরের মেহনত করে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছাতে সহায়তা করেছেন।

সবশেষে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই বইটি-সহ উমেদ প্রকাশের প্রতিটি কাজ কবুল করেন, উপকারী করেন। আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়ার উপলক্ষ্য বানান। আমাদের যেন ইখলাস নসীব হয়, খাতেমা বিল খায়ের নসীব হয়। আল্লাহুম্মা আমীন।

মুহাম্মাদ হোসাইন

দারুত তাসনিফ, উমেদ প্রকাশ

২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪

মোতাবেক ১৯ অক্টোবর ২০২২

৮৫৭/১, মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা।

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| শুরুর কথা | ৯ |
| ঈমান-আমলের প্রস্তুতি | ১৮ |
| মানসিক প্রস্তুতি | ২৪ |
| শারীরিক প্রস্তুতি | ৩২ |
| আর্থিক প্রস্তুতি | ৩৭ |
| কুফু মিলিয়ে বিয়ে করা | ৫০ |
| পরিবারকে রাজি করানো | ৫৭ |
| শরীয়তসম্মত বিয়ে ও সংসারের প্রস্তুতি | ৬০ |
| প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে নেয়া | ৬৬ |
| তালাক-সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা | ৬৯ |
| অভিজ্ঞদের থেকে পূর্ব-পরামর্শ গ্রহণ | ৭৯ |
| সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যত্র সময়ের অপচয় কমানো | ৮১ |
| বিবাহ প্রস্তুতির সারকথা | ৯২ |
| বিয়ে-বিষয়ক কিছু ফ্যান্টাসি | ৯৭ |
| পারিবারিক কলহ সমাধানের উপায় | ১১৬ |
| উপসংহার | ১২৫ |

ভাবিয়া করিও বিয়ে

করিয়া ভাবিওনা

## শুরুর কথা

বিয়ে—মানবজীবনের একটি সুখপর্বের নাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সুন্নাহ। শরীয়তে বিবাহকে বিধিবদ্ধ করার অন্যতম কারণ হলো, মানুষ যাতে বিয়ের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে।

হযরত আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

> مَن تزوَّجَ فقدِ استَكْمَلَ نصفَ الإيمانِ فليتَّقِ اللهَ في النِّصفِ الثاني
>
> 'যে ব্যক্তি বিয়ে করল তার ঈমানের অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাকি অংশের জন্য যেন সে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।'[১]

বিয়ে ঈমানের অর্ধেক হওয়ার রহস্য হলো, অন্য হাদীসের মধ্যে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে মানুষের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ দুটো অঙ্গ হেফাজতকারীর জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিম্মাদারী নিয়েছেন!

> مَن يَضْمَنْ لي ما بيْنَ لَحْيَيْهِ وما بيْنَ رِجْلَيْهِ، أضْمَنْ له الجَنَّةَ.
>
> 'যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অংশ এবং দুই পায়ের মাঝের অংশের সংরক্ষণের ব্যাপারে ওয়াদা দেবে, আমি তার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়ে নিলাম।'[২]

---

১. তাবারানী, হাদীস নং ৭৬৪৭

২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৪

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, দুই পায়ের মাঝের অংশ অর্থাৎ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ মানুষের জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আর বিয়ে লজ্জাস্থান হেফাজতের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। কারণ, বিয়ের মাধ্যমে মানুষ লজ্জাস্থান-কেন্দ্রিক গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়। তাই হাদীসের মধ্যে অর্ধেক শব্দ দিয়ে বাহ্যিক কোনো পরিমাণ বোঝানো হয়নি, বিয়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট করে বুঝতে এ ব্যাপারে আমরা আরও একটি হাদীস দেখতে পারি :

مَن رَزَقَهُ اللهُ امرَأَةً صَالِحَةً فَقَد أَعَانَهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطرِ الثَّانِي.

'আল্লাহ তাআলা যাকে নেককার বিবি দান করেছেন তাকে যেন তিনি দ্বীনের অর্ধেকাংশ পূরণে সাহায্য করলেন; অতএব সে যেন এখন দ্বীনের বাকি অংশ প্রতিপালনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।'[৩]

নেককার বিবি জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম সহযোগী। নেককার বিবির মাধ্যমে ঘরে দ্বীনী ও আমলী পরিবেশ তৈরি হয়, এতে মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা ঠিক থাকে। সব সময় মন প্রফুল্ল থাকে। আর গুনাহ থেকে বাঁচার ও আমলে মনোনিবেশ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সুস্থ মানসিকতা ও প্রফুল্ল মন। আল্লাহ তাআলা সূরা রুমের মধ্যে বলেছেন,

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।'[৪]

---

৩. তাবারানী, মুজামুল আউসাত, ১/২৯৪। হাদীস নং ৯৭২। মুসতাদরাকু হাকীম, হাদীস নং ২৬৮১; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস নং ৫৪৮৭। ইমাম হাকীমের সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবীও তা সমর্থন করেছেন।

৪. সূরা রুম, (৩০) : ২১

মোদ্দাকথা, বিয়ের মাধ্যমে একজন মানুষ তার ঈমানকে অনেকাংশেই পূরণ করতে পারে এবং বহু গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। হাদীসের মধ্যে আমরা এর আরও প্রমাণ পাই :

> يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ.
>
> 'হে যুবকের দল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন তা করে নেয়। কারণ, বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা যৌন উত্তেজনাকে দমিয়ে দেয়।'[৫]

এসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, বিয়ে মানুষের ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করার জন্য অন্যতম সহায়ক। আমাদের দ্বীনদার তরুণ-তরুণীরা বর্তমানে এসব হাদীস জেনেই বিয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এটা বেশ আশাজাগানিয়া ব্যাপার—তারা বুঝতে পারছে যে, সমাজের গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নামক ট্রেন্ড থেকে বেরিয়ে শরীয়তসম্মত হালাল ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়তে হবে। তারা বুঝতে পারছে যে, অবৈধ সাময়িক আনন্দ কখনোই জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণীত জীবনবিধানেই অনাবিল সুখ ও শান্তি নিহিত রয়েছে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন অশ্লীলতাকে প্রমোট করা হচ্ছে। এর পক্ষে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী(!) ও নেটিজেনরা মতামত দিচ্ছে। সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারের মতো ধ্বংসাত্মক কাজকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে বুলি আওড়ানো হচ্ছে। এর পক্ষে সাফাইও গাওয়া হচ্ছে। অথচ সমকামিতার কারণে কওমে লুতকে আল্লাহ তাআলা তাদের আবাসভূমি উল্টে দেয়ার মতো ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন! অথচ এমন ধ্বংসাত্মক কাজকেই আজ আমাদের সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে অভিহিত করা হচ্ছে!

এদিকে মিডিয়ার অশ্লীলতা ও যৌন-আবেদনময়ী বিভিন্ন কন্টেন্টের প্রচারের ফলে তরুণ-তরুণীদের নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ

---

৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০০

থাকলে তারা হারাম উপায়ে সেটা করছে, সুযোগ না থাকলে মাস্টারবেশনসহ বিভিন্ন উপায়ে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছে।

এসব সমস্যার সমাধানস্বরূপ 'সময়মতো বিয়ে'-কে কার্যকরী পন্থা ধরা হচ্ছে। অনলাইন-অফলাইনে ক্যাম্পেইন করা হচ্ছে। প্রচুর অর্থ ঢেলে বিয়ের আয়োজনের বিপরীতে ইসলামী নিয়মে স্বল্প খরচে বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এসব কাজ অবশ্যই অ্যাপ্রিশিয়েটযোগ্য। বর্তমান সময়ের হিসেবে অবশ্যই খুব প্রয়োজনীয়। তবে এসব 'সময়মতো বিয়ে'র ক্যাম্পেইনগুলোতে বাস্তবতা-বিবর্জিত বেশকিছু ফ্যান্টাসি কাজ করে। আর বেশির ভাগ তরুণ-তরুণী এসব ফ্যান্টাসিতে ডুবে থাকে। ফলে সময়মতো বিয়ে নিয়ে এত ক্যাম্পেইন হওয়ার পরও খোদ ক্যাম্পেইনারদের বড় অংশই সময়মতো বিয়ে করতে পারছে না। আবার কারও কারও বিয়ে হয়ে গেলেও এতদিনের ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসার পর সে বুঝতে পারে—এখন সে কূলহীন সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে, যেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো পথ নেই। তখন সে এক টুকরো খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার আশায় অন্ধকারেই হাতড়াতে থাকে। কিন্তু দিনশেষে সংসার নামক কূলহীন এক সমুদ্রে সে একাকী ভাসতে থাকে। কারও ক্ষেত্রে বিরূপ ফলাফল দেখা যায়। যার বাস্তব নমুনা আমাদের আশেপাশে খুঁজলে অহরহ পাওয়া যাবে। আমরা কিছু কেইস পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও সহজে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ।

**কেইস - ১ :** আবদুল্লাহ (ছদ্মনাম), ঢাকার এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের এক ছেলে। বাবা মোটামুটি দ্বীনের বুঝ রাখেন। কিন্তু ছেলে তার মনমতো হয়নি। এককথায় উচ্ছৃঙ্খল বলা চলে। ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন বাসা থেকে অনেকবার বোঝানো হয়, পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু একটা কাজ যেন সে করে। এতে মধ্যবয়স্ক বাবার আয়-রোজগারের চিন্তা কিছুটা কম হবে। এই তো সেদিনও বাসায় এ নিয়ে বেশ ঝগড়াঝাঁটি হলো। মা বললেন, পাশের ফ্ল্যাটের সুমন (ছদ্মনাম)-ও তো ইন্টারেই পড়ে। ওর মাসিক আয় কত জানিস তুই? এক লাখ টাকার কাছাকাছি। বাবাহারা এতিম ছেলেটা একা বাসার সব খরচ টানে। দুই বোনকে পড়ালেখা করায়। এরপর শুনলাম নিজের বিয়ের জন্যও না কি এখন থেকে টাকা জমায়! আর তুই কী করলি গাধা!

কে শোনে কার কথা! আব্দুল্লাহ বাসা থেকে রাগ করে বেরিয়ে যায়।

এর কয়েক মাস পর মহল্লার মসজিদের তাবলীগের সাথিভাইরা তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাবলীগে নিয়ে যায়। বেশ ভালো কথা। মহল্লায় ফিরে আসার পর তিন দিন তাবলীগে সময় দেয়ায় তার মাঝে টুকটাক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ সুবাদে দ্বীনী কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে সে। এ ছাড়া অনলাইনেও বেশ কয়েকজন আলেমের বয়ান শোনা শুরু করে। এর কিছুদিন পর হঠাৎ তার মধ্যে বিয়ের আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্যাপারটা বাসায় জানাজানি হলে বাসার সবাই আবারও তার প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হয়। মা বলে, তুই সবে ইন্টার পড়ছিস, কামাই নেই এক আনাও, বিয়ে করে বউকে কী খাওয়াবি? তখন সে মাসআলা শুনিয়ে সবাইকে মোটামুটি ফাসেক সাব্যস্ত করে ফেলে। সন্তান সাবালক হয়ে গেলে বিয়ে না দিলে সন্তান যদি কোনো গুনাহ করে, তাহলে এর দায়ভার বাবা-মায়ের ওপর পড়ে—সদ্য শেখা এই হাদীসটিও সে বলতে ভোলেনি। তার অসহনীয় চাপাচাপিতে মাস ছয়েক পর তাকে বিয়ে করিয়ে দেয় বাবা-মা। বিয়ের পর বিবিকে নিয়ে বাবা-মায়ের সাথেই থাকা শুরু করে সে। কিন্তু মধ্যবয়স্ক একজন বাবা আর কতদিন ছেলের পরিবার টানবেন, তার তো নিজের পরিবার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। ফলে বছর পেরোবার আগেই শুরু হয় ছেলের সাথে বাবা-মায়ের মনোমালিন্য। একে তো ছেলের পড়ালেখা কম হওয়ার কারণে তেমন কোনো চাকরিও পাচ্ছিল না। আবার অন্য কোনো দক্ষতা না থাকার কারণে কিছু করতেও পারছিল না। ফলে একপর্যায়ের বেকার হয়েই বসে থাকতে হয় তাকে। এই মনোমালিন্য ধীরে ধীরে বউ-শাশুড়ির ঝগড়ার রূপ নেয়।

**কেইস - ২ :** আবদুর রহমান (ছদ্মনাম) সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। এলাকায় সারাদিন ঘোরাঘুরি করাই যেন তার প্রধান কাজ। বয়সও অল্প। তার উচ্চবিত্ত পরিবারে টাকা-পয়সার কোনো সমস্যা নেই। এসএসসির পর ফেসবুকে বিয়ে-বিষয়ক একটি গ্রুপে কানেক্টেড হয় সে। তাদের লেখাজোখা পড়ে বিয়ের জন্য পাগলপাড়া হয়ে যায়। বাবা-মায়ের একমাত্র আদরের সন্তান অবশেষে জোর করেই যেন বিয়ে করে বসে। বিয়ের পর প্রথম কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তার ভেতরকার পুরোনো স্বভাব আবার জেগে ওঠে। আবারও এলাকায় ঘোরাঘুরি, গেমিং নেশা, মেয়েদের সাথে আড্ডা ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে যখন স্ত্রীর প্রতি তার ফ্যান্টাসি কেটে যায় তখন আরেক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলাফল—বিয়ের এক বছরের মাথায় বিবাহবিচ্ছেদ!

ওপরের দুটি কেইস তো পড়লেন, এর মানে এই নয় যে এমন ঘটনা কেবল ছেলেদের ক্ষেত্রেই ঘটছে। মেয়েদের পক্ষ থেকেও যা ঘটেছে তার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। আসুন এমন কেইসও আমরা পড়ি :

**কেইস - ৩ :** মেয়েটির বয়স এখনো ১৮ পেরোয়নি, তবে দ্বীন পালনের চেষ্টা করে। হিজাব-নিকাব সব আমলই চলছে। পারিবারিক পরিবেশও বেশ সহায়ক। ব্যবসায়ী বাবা তার দ্বীন-চর্চায় অমত তো করেনইনি; বরং সমর্থন ও সাহায্য করে গেছেন। ফেসবুকে তার প্রোফাইলে রয়েছে বিভিন্ন দ্বীনী পোস্ট। সে নিজের স্বপ্নের কথা লিখেছে সেখানে—স্বামীর সাথে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়বে, দুজনে এক সাথে দ্বীন পালন করবে, দ্বীন শিখবে, একে অপরের সহধর্মী ও সহমর্মী হবে।

তার মনে হয়েছে এখনই দ্রুত বিয়ে করা দরকার। এই নষ্ট পরিবেশে বিয়েবিহীন কি থাকা যায়? তার ওপর সে মেয়ে, যত দ্রুত বিয়ে করতে পারে ততই তো ভালো। বাসায় জানিয়েছে বিষয়টা। আর দশজন বাবা-মায়ের মতো তার বাবা-মা এতে কোনো নেগেটিভ রি-অ্যাকশন দেননি, তাঁরা বলেননি, কী বেহায়া নির্লজ্জ মেয়ে!

তাঁরা সর্বাধিক চেষ্টা করেছেন মেয়ের জন্য একটি ভালো ও দ্বীনদার পাত্র খুঁজতে। অবশেষে তাঁরা মনমতো একটি পাত্র পেলেন। ছেলে দ্বীনদার, আয়-উপার্জনও মাশাআল্লাহ ভালো। মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী পরিবারের ছেলে।

উপযুক্ত দিনক্ষণে বিয়েটাও সুন্নাত পদ্ধতিতে হয়ে গেল। উভয়ের মাঝেই একে অপরকে পাওয়ার আনন্দ তখন জ্বলজ্বল করছে। আসলেই কি তাই? উভয়ের পাবার চেতনা কি একই রকম?

না প্রিয় পাঠক, এখানেই গন্ডগোলটা বেঁধে গেল। বাসর রাতে অনেক স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই শারীরিক সম্পর্ক হয় না, সাধারণত তারা একে অপরকে বুঝতে সময় নেয়, জানতে সময় নেয়, সম্পর্কটা একটু স্বাভাবিক হলে শারীরিক সম্পর্কে গতি বৃদ্ধি পায়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে তাদের মাঝে শারীরিক মিলন হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দেখতে দেখতে কয়েকটি মাস কেটে গেল। মেয়েটা কিছুতেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। এদিকে ছেলেটা তো নিজের চরিত্র হেফাজত করতেই বিয়ে করেছিল। শারীরিক সম্পর্কই যদি না হয়, তাহলে কীভাবে হবে চরিত্র হেফাজত?

ছেলেটা মেয়েটাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, এমনকি ডাক্তারও দেখাল। আসলে হয়েছিল যা তা হচ্ছে, এই মেয়েটা স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় যে শারীরিক সম্পর্ক, তাকে প্রবৃত্তিগতভাবেই অপছন্দ করত। তার কিছুতেই স্বামীর ঘনিষ্ঠ হতে মন চাইত না, এসবকে ঘৃণা করত সে।

তাহলে বলা যায় তার শারীরবৃত্তীয় মানসিক পরিপক্কতা আসলে আসেনি। তাহলে বিয়ে করল কেন?

আসলে সে বিয়ে করেছিল ঝোঁকের মাথায়। ফেসবুকে সে বিয়ে সম্পর্কিত অনেক সুন্দর সুন্দর আলোচনা পড়েছিল, যার মাঝে পারিবারিক সম্পর্কের বাস্তব চিত্র এবং শারীরিক সম্পর্কের উপস্থাপনা ছিল না, ছিল অবসর যাপন আর কাব্যিক রোমান্টিসিজমের কিছু প্রেরণা। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু যখন বাস্তবতা সামনে এল, তা আর মেনে নিতে পারল না।

একপর্যায়ে সে স্বীয় স্বামীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করতে শুরু করে, এমনকি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও শুরু করে। বেশ কয়েক মাস টেনে নেবার পর একপর্যায়ে এই অপরিণত সম্পর্কের ইতি ঘটে।

মাঝখান থেকে একজন ছেলের জীবনে এটা একটা মানসিক ট্রমার ইতিহাস হয়ে গেল, উভয় পরিবারকে দিয়ে গেল কিছু তিক্ততার স্মৃতি।

**কেইস - ৪ :** এবারের ঘটনাটি কিন্তু আরও রোমহর্ষক। উচ্চবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে দ্বীনে প্রবেশ করল। তার পরিবারকে ঠিক উচ্চবিত্ত বললেও কম হবে, অতি উচ্চবিত্ত। দ্বীনে প্রবেশের পর কঠোরভাবে দ্বীনী বিধানাবলি পালন শুরু করল। তার মাঝে ছিল আগ্রহ, উদ্দীপনা আর পরাকাষ্ঠা। হিজাব-নিকাব সঠিকভাবেই পালন করছিল সে।

কিন্তু পরিবারে ভয়ানক অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হলো। তার বাবা মেয়ের বোরকায় আগুন ধরিয়ে দিল। এরপরও দমে যায়নি মেয়েটি, সর্বাত্মক দ্বীন পালন চালু রাখে, যতটা সম্ভবপর হয় আরকি।

এ পর্যায়ে হয়তো এভাবে একটা সময়ে কিছু ভালো ফল আসলেও আসতে পারত, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন; কিন্তু মেয়েটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সে চারিদিকের বিভিন্ন কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে গোপনে এক ছেলেকে বিয়ে করে ফেলল।

ছেলেটা বাহ্যিকভাবে দ্বীনদার বটে। পরিবারও দ্বীনদার। এ ছাড়া তার পরিবারও আর্থিকভাবে উচ্চবিত্তই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। ছেলেটার মাঝে ছিল বাউন্ডুলে স্বভাব। সে হুট করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল, কেননা সে এসব সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে চায় না। কিন্তু অন্য কোনোভাবে নিজের উপার্জনের কোনো ব্যবস্থাও সে করেনি; বরং তার দিন কাটত বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে, দ্বীনী বিষয়ে লেকচার দিয়ে। হ্যাঁ, দ্বীনী ইলম অর্জনের কোনো সিরিয়াস স্টেপও কিন্তু সে নেয়নি।

এসব জানার পরও মেয়েটা তাকে বিয়ে করে, সম্ভবত অন্যদের অনুপ্রেরণায়। তখন অনেকেই বলেছে, এই ভাইটা দ্বীনের ব্যাপারে খুব সিনসিয়ার, এমনকি পড়াশোনাও এ জন্য ছেড়ে দিয়েছে।

এমন জটিল পরিস্থিতিতে এই মেয়ের উচিত ছিল এমন কাউকে বিয়ে করা, যে তাকে সাপোর্ট দিতে পারত, তার সহমর্মী হতে পারত, তার কষ্টগুলো ভাগ করে নিতে পারত। কিন্তু সে এসব না দেখে কেবল দ্বীনদারী দেখে বিয়ে করে ফেলে, যা আপাত-বাহ্যিক ছিল।

তাদের অবস্থা তো এমন হয়ে যায় যে, উভয়ে একান্তে অবস্থান করবে এমন কোনো ঠিকানাও তাদের ছিল না। একপর্যায়ে পরিবারের ভয়ানক চাপ তার ওপর আসতে থাকে। এদিকে কয়েক বছর হয়ে গেলেও ছেলেটার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এতদিন পর হঠাৎ যেন সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার আসলে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। সে এরপর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায়। অথচ মাঝ থেকে চলে গেছে কতগুলো দিন। তার স্ত্রী এখন তার থেকে ক্লাসে অনেক সিনিয়র।

মেয়ের পরিবারে এই বিয়ের কথা জানা ছিল না। তারা ক্যারিয়ার-বিয়ে এসব নিয়ে তাকে ভয়ানক চাপ দেয়। অথচ তার স্বামী-রত্নটি তাকে ন্যূনতম সমর্থনও জোগাতে ব্যর্থ হয়। আদৌ চেষ্টা করেছিল কি না তাও আমাদের জানা নেই।

মেয়েটা এই চাপের সামনে একপর্যায়ে ভেঙে পড়ে। এদিকে স্বামীর ব্যবহার দেখে ও দ্বীনী কমিউনিটির অন্যান্যদের অবস্থা দেখে সে একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে দ্বীন থেকেই বের হয়ে যায়, আল ইয়াজুবিল্লাহ। বর্তমানে সে এক্সট্রিম সেক্যুলার জীবনযাপন করছে। যা উল্লেখ করে পাঠকদের বিব্রত করতে চাই না।

এমন হাজারও কেইস আমাদের আশেপাশে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। পাঠকের কাছে প্রশ্ন, এই কেইসগুলোর মূল সমস্যাটা কোথায়? অল্প বয়সে বিয়ে করা? মোটেই না। মূল সমস্যাটা হলো তাদের প্রি-ম্যারেজ কিছু প্রস্তুতির অভাব। বিয়ের আগে তারা ছিল স্বপ্নে বিভোর—বিয়ের পর দুজন মিলে একসাথে বারান্দা-বিলাস করবে, একসাথে রিকশায় বসে শহর ঘুরে দেখবে, বৃষ্টি-বিলাস করবে, দুজন একসাথে কফি বানিয়ে খাবে। কিন্তু বিয়ের পর যখন তারা চোখ ডলতে ডলতে বাস্তবতায় ফিরে আসে তখন তাদের ভুল ভাঙে। তখন তারা বুঝতে পারে, বিয়ে মানেই শুধু রঙিন স্বপ্ন নয়। বিয়ে মানেই রিকশায় হুড তুলে শহর ঘুরে বেড়ানো নয়। বিয়ে মানেই দুজন একসাথে বসে চায়ের কাপে ভালোবাসার ঝড় তোলা নয়; বরং বিয়ে মানে দায়িত্ববোধ। সারাজীবন একটি মেয়ের পাশে থাকা। একটি ছেলের পাশে থাকা। তার আস্থার জায়গা হওয়া। অনাগত একজন মানুষের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হওয়া। কিন্তু তখন যেন তাদের বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফলে সংসার নামক উত্তাল সমুদ্রে তারা খেই হারিয়ে ফেলে।

তাই যেসব তরুণ-তরুণী সময়মতো বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা কিছু বিষয় মাথায় রাখলেই এসব সমস্যা এড়াতে পারবেন বলে আশা করছি। বিষয়গুলো আমরা পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিচ্ছি, লেখাগুলো সময়মতো বিয়ের ব্যাপারে অনুৎসাহিত করার জন্য নয় কোনোভাবেই; বরং সময়মতো বিয়েটা যাতে নির্ঝঞ্ঝাট হয়, বিয়ের পর যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, এবং বিয়ের পূর্বে কোনো ধরনের ফ্যান্টাসি যাতে মনের ভেতর কাজ না করে, এটাই উদ্দেশ্য।

# ঈমান-আমলের প্রস্তুতি

বিয়ের প্রথম প্রস্তুতি হলো নিজের ঈমান-আমল ঠিক করা। ঈমান-আমল ঠিক করার আগেই বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া মানে নিজের ঘরে নিজেই আগুন দেয়া। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে সৎ পুরুষদের জন্য সৎ নারী এবং অসৎ-দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য অসৎ-দুশ্চরিত্রা নারীকেই উপযুক্ত বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। তাই এলাকার বখাটে ছেলেদের তাদের মতোই বখাটেদের সাথে মিশতে দেখা যায়। আবার এলাকার দ্বীনদার ছেলেরা তাদের মতোই নম্র-ভদ্র, দ্বীনদারকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। এই যোগসূত্রটি বিয়ের সময়ও কাজ করে মারাত্মকভাবে। যে ছেলে অশ্লীলতা, উদ্দামতা আর বেহায়াপনাকে পছন্দ করে, সে তার মতোই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সে কখনো চাইবে না, কোনো বোরকাওয়ালি দ্বীনদার মেয়ে তার ঘরে এসে তার এসব কাজে বাধা দিক। একইভাবে যে মেয়ে অশ্লীলতা, উদ্দামতা আর বেহায়াপনাকে পছন্দ করে, সেও চাইবে না কোনো দাড়িওয়ালা ও কথিত আনস্মার্ট ছেলেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে; সে চাইবে না এমন কেউ এসে তার জীবনের আপাত সুখগুলোর গোড়ায় পানি ঢেলে দিক।

আবার একজন দ্বীনদার ছেলে, যে ঠিকমতো নামাজ পড়ে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম মানার আপ্রাণ চেষ্টা করে, সে কখনো পর্দাহীন, দ্বীনহীন এক মেয়েকে তার ঘরে বউ হিসেবে আনতে চাইবে না। আল্লাহ তাআলা এটাই বলেছেন কুরআনুল কারীমের সূরা নূরের মধ্যে,

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

'দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য।'[৬]

একইভাবে যে মেয়েটা এই কলুষিত যুগে ও কলুষিত সমাজে বাস করেও নিজের চরিত্রকে হেফাজত করেছে, মাহরাম, গাইরে মাহরাম মেইন্টেইন করেছে, যে চায় তার স্বামী হবে ইহ ও পরকালীন জান্নাতী সাথি, সে তো এমন কারও বউই হতে চাইবে, যে হবে দ্বীনদার, সচ্চরিত্রবান একজন সুপুরুষ।

এ জন্য বিয়ের আগে নিজের ঈমান-আমল ঠিক করতে হবে। তখন রুচি-চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তেমন জীবনসাথি মিলিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

কারও যদি স্বভাব থাকে গান শোনার, ছবি দেখার, গাইরে মাহরামদের সাথে আড্ডা দেয়ার, তাহলে সে চাইবে এমন কেউই তার ঘরে আসুক, যে তার মতো গান শুনবে, তাকে গান শোনাবে, একসাথে এক বালিশে মাথা দিয়ে সিনেমা দেখবে; শুক্রবার ছুটির দিন তাকে নিয়ে সে মুভি দেখতে যাবে, বন্ধুর বিয়েতে গভীর রাত পর্যন্ত পার্টিতে সময় কাটাবে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বাসায় বন্ধুরা এসে আড্ডা দেবে।

আবার যে ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত থাকে, সব সময় কুরআন তিলাওয়াত করে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা এড়িয়ে চলে, সে চাইবে তার ঘরে এমন কেউই আসুক, যে তাকে রাতের তাহাজ্জুদে জাগিয়ে দেবে, ঘুম না ভাঙলে চোখে পানি দিয়ে ঘুম ভাঙানোর সুন্নাত জিন্দা করবে, মাঝে মাঝে দুজন দুজনকে কুরআন তিলাওয়াত শোনাবে, স্ত্রী কুরআন ভালোভাবে পড়তে না জানলেও শিখতে উদ্‌গ্রীব থাকবে, আবার মাঝে মাঝে তার সাথে খুনশুটিও করবে।

এ জন্য আবশ্যক হলো বিয়ের আগেই নিজের ঈমান-আমল ঠিক করে নেয়া। গুনাহ ত্যাগ করা। বাজে কোনো নেশা থাকলে তা ছেড়ে দেয়া। অনেকেই ভেবে থাকেন, বিয়ে করে ফেললেই তো গুনাহ কমে যাবে। তাদের এই ধারণা অনেকাংশেই অমূলক এবং কার্যত এমনটা হয়ও না; বরং গুনাহ ছেড়ে দিলে আল্লাহ তাআলা উত্তম জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন এমন চিন্তা করতে হবে। কারণ বিয়ে হলো রিযিক। আর গুনাহের কারণে হাতের রিযিকও ছিনিয়ে

---

৬. সূরা নূর, (২৪) : ২৬

নেয়া হয়। আর গুনাহ ত্যাগ ও নেক আমলের কারণে দূরের রিযিকও কাছে চলে আসে। এমনকি আল্লাহ তাআলার প্রতি তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে অভাবনীয় রিযিকও নাগালে চলে আসে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোনো-না-কোনো পথ বের করে দেবেন। এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।"[৭]

আর নেককার স্বামী-স্ত্রী পাওয়ার চেয়ে উত্তম রিযিক আর কী হতে পারে! এ জন্য বিয়েতে উত্তম সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাওয়ার অন্যতম উপায় হচ্ছে গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাক্ওয়া অবলম্বন করা এবং নিজেকে স্থির রাখা। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এমন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসবে, যা কল্পনার বাইরে।

এ জন্য বিয়েতে দেরি হলে বা উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর সন্ধান না পেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বুঝতে হবে এখানে আমার আমলের কমতি আছে কিংবা তাকদীরে বিয়েটা বোধহয় আরেকটু দেরিতেই লেখা আছে। এমতাবস্থায় সবর করতে হবে।

মোদ্দাকথা, বিয়ের পূর্বে ঈমান-আমলের সংশোধন আবশ্যক। নাহয় বিয়ের পর পুরোনো বাজে স্বভাব আবারও জেগে উঠার সম্ভবনা প্রবল থাকে, এবং বাস্তবে এমনটাই হয়। ফলে সংসারে অশান্তির অনল জ্বলে ওঠে। ঘর জান্নাতের টুকরো হওয়ার বদলে হয়ে যায় জাহান্নামের একটি অংশ। অথচ দেখা যাবে তাদের পরিবারে সম্পদের কোনো অভাব নেই। শুধু একটি জিনিসের অভাব ছিল বিয়ের পূর্বে, তা হলো বিশুদ্ধ ঈমান ও আমল। যার ফল বিয়ের পর ভোগ করতে হয় এবং এর সমাধানও খুব সহজেই হয় না।

---

৭. সূরা তলাক, (৬৫) : ২-৩

কারণ, বিয়ের আগে যে পুরুষ বা নারীর বাজে কোনো গুনাহের অভ্যাস থাকে, সেটাকে ত্যাগ না করে যদি বিয়ে করে, তাহলে বিয়ের পর সেটা একেবারে ছেড়ে দেয়া অসম্ভব। পরবর্তী সময়ে এর বাজে প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর। এর শেষ পরিণতি হলো, পরবর্তী প্রজন্মকেও গুনাহের পথে উঠিয়ে দিয়ে যাওয়া।

বাস্তব জীবনে এমন হাজারো উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক কিছু গুনাহ এমন যে, এগুলোতে আসক্ত লোকেরা যেন মাদকাসক্তের ন্যায়, কিছুতেই ছাড়তে পারে না। বিশেষ করে পর্নোগ্রাফি, নাটক-সিনেমা, গান-বাজনা এগুলো এমন কিছু গুনাহ, যা আপাত দ্বীনদারদের মাঝেও আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুঃখজনক বাস্তবতা আমাদের বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হচ্ছে।

যারা কাউন্সেলিংয়ের কাজ করেন তাদের ভাষ্যমতে, বিয়ের পরও এসব বদভ্যাস সাধারণত যেতে চায় না; হ্যাঁ, কারও কারও ঠিক হয়, কিন্তু সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা নয়। অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা পুরাতন রোগ থেকে আরোগ্য তো লাভ করছেই না; বরং নিজের আসক্তিতে নিজের স্ত্রীকেও শামিল করতে চেষ্টা করছে, আল ইয়াজুবিল্লাহ।

আসলে এসব রোগের মূল সমাধান হলো 'আল্লাহর ভয়'। যদি আল্লাহর ভয় বান্দার অন্তরে জাগরূক না থাকে, তাহলে হাজারো উপদেশেও কোনো কাজ হবে না। দেখা যাবে রোগ কেবল বাড়তেই থাকবে। যারা বিয়ের আগেই আল্লাহভীতি অর্জনের চেষ্টা করবেন, বিয়ের আসল সফলতার মুখ তারাই দেখবেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অত্যন্ত মূল্যবান এক সম্পদ। যে এর কদর করে, এর জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন।

বিয়েও এই চেষ্টার একটা শক্ত পদক্ষেপ তা সত্য, তবে আমরা জিনিসটাকে যদি এভাবে বুঝি, তাহলে বুঝতে আরও সহজ হবে ইনশাআল্লাহ :

বিয়ে হলো একটা নেক আমল, আর গুনাহ হলো বদ আমল। নেক আমলের আগে বদ আমল ছেড়ে দেয়া তওবা কবুলের একটা পূর্বশর্ত। সমস্ত আলেম একমত যে তওবা করতে চাইলে আগে গুনাহ ছাড়তে হবে, এতে অনুতপ্ত হতে হবে, এরপর এই গুনাহ আর কখনো করবে না এমন দৃঢ় সংকল্প মনে পোষণ করতে হবে।

এখন দেখুন, বিয়ে নামক নেক আমলটি করার আগে যদি আপনি গুনাহ ছেড়ে

তওবা নাই করতে পারেন, তাহলে এই নেক আমল কবুল হবে কীভাবে, এর বরকত আপনি পাবেন কীভাবে?

হ্যাঁ, কখনো নেক আমলের বরকতে বান্দার গুনাহ দূর হয়; কিন্তু এর জন্য বদ আমল ছাড়ার পূর্ব-প্রয়াস লাগে। যে লোক লাগাতার বদ আমল ছাড়তে চেষ্টা করে যাচ্ছে, সে যখন এর পাশাপাশি নেক আমলও করে তখন তা হয় সোনায় সোহাগা; এই প্রয়াসে সাফল্য আসে। এ জন্য আগে গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। যদি আল্লাহর রাস্তায় এই প্রয়াসের গ্যারান্টি আপনি দিতে পারেন, তাহলে হিদায়াতের গ্যারান্টি আল্লাহ নিজেই আপনাকে দিচ্ছেন। তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।'[৮]

কাজেই বিয়ের আগে থেকেই গুনাহ ত্যাগের অভ্যাস করতে হবে, নয়তো বিয়েতে বরকত পাওয়া দুষ্কর। এ ছাড়া এই গুনাহের কারণে ভালো স্বামী বা স্ত্রী পাওয়াও কঠিন হয়ে যেতে পারে।

তাই তো যেসব তরুণ-তরুণীরা ঈমান-আমল ঠিক করার পূর্বেই বিয়ে করে, বিয়ের কিছুদিন পর তাদের সমস্ত ফ্যান্টাসি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তারা তখন একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। এর থেকে উত্তরণের কোনো পথও খুঁজে পায় না। আর গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা ও তাকওয়ারও তাওফীক পায় না। অথচ আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের ওপরেই নির্ভর করে। তারা অনেক টাকা কামাই করা সত্ত্বেও বরকত পায় না। কারণ, বরকতময় রিযিক তো কেবল ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করে যারা বিয়ে করে তাদের জন্যই নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

৮. সূরা আনকাবুত, (২৯) : ৬৯

‘দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকেরা যা বলে, তারা তা থেকে মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।’[৯]

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না বললেই নয়, তা হলো এই ঈমানী প্রস্তুতি কিন্তু স্বল্পকালীন হলে হবে না। আপনাদের নিশ্চয় শুরুর কেইসগুলো মনে আছে। বাস্তবতা হলো, অনেকেই দ্বীন পালন শুরু করামাত্র বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। অথচ এখনো তার ঈমান আমল পাকাপোক্তই হয়নি! যে জমিনের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে, তা যেকোনো মুহূর্তেই ধসে পড়তে পারে। আর একবার ধসে পড়লে এরপর একদম অতল গহ্বরে গিয়ে পড়া লাগবে।

এ জন্য নিজের ঈমান ও আমলের উন্নয়নের স্বার্থে কিছুটা সময় ধৈর্য ধরুন, স্থির হোন, ঈমান-আমল একটা স্থিতিশীল অবস্থায় আসুক, এতটুকু আশ্বস্ত হোন যে, আশা করা যায় আর পড়ে যাবার ভয় নেই; এরপর সামনে বাড়ুন। এটা বলছি না যে এই প্রয়াসের জন্য গোটা জীবনই অপেক্ষা করতে হবে; বরং অন্তত বছরখানেক দেখা উচিত নিজের দ্বীনী ও ঈমানী অবস্থা কীরূপ। নিজের হিসেব নিজেকেই নিতে হবে, এটা অন্য কেউ করে দেবে না, নিজের গুনাহ ও আমল সম্পর্কে মানুষ নিজেই ভালো জানে।

এ জন্য উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেছিলেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ

‘তোমাদের হিসেব নেয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসেব নাও। কেননা, এটাই অধিকতর সহজ।’[১০]

৯. সূরা নূর, (২৪) : ২৬

১০. ইমাম ইবনুল মুবারক রহ., কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক, হাদীস: ৩০৬

# মানসিক প্রস্তুতি

বিয়ের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার। 'বাবা, আমি বিয়ে করব' এটা কোনো মানসিক প্রস্তুতি নয়। মানসিক প্রস্তুতি হলো, সর্বপ্রথম নিজের সাথে এই কমিটমেন্ট করতে হবে, আমি দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। দায়িত্ব বলতে শুধু তাকে আমি আজীবন ভালোবেসে যাব—এটা নয়। স্বামী তার স্ত্রীর আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সব সমস্যায় পাশে থাকবে, এটাকে মানসিক প্রস্তুতি বলে। একইভাবে স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে, সে স্বামীর সহমর্মী হতে যাচ্ছে, তার পরিবারের কাজকর্মের একটা বড় দায়িত্ব স্বীয় কাঁধে তুলে নিতে যাচ্ছে। মনের মধ্যে এই কথা বদ্ধমূল করে নিতে হবে, আমি এখন কারও স্বামী বা স্ত্রী হতে যাচ্ছি, শীঘ্রই বাবা বা মা হব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং আমার কাজকর্ম-চলাফেরা-কথাবার্তার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে।

একজন পুরুষকে মনে রাখতে হবে, আগে যেমন আমি আড্ডা দিয়ে অনেক রাত করে বাসায় ফিরতাম, এখন তা করলে চলবে না; বরং সময়মতো ঘরে ফিরতে হবে। আগে যেমন সারাদিন বাসায় বসে মোবাইলে গেমস খেলতাম, এখন তা করলে চলবে না; এখন আমাকে সংসারের হাল ধরতে হবে। আগে যেমন আমি ছিলাম খুব দুরন্ত, অস্থির প্রকৃতির, এখন হতে হবে শান্তশিষ্ট, ধীরস্থির। আগে আমি যেকোনো কাজ হুটহাট করে বসতাম, ভুল হলে তো ধরিয়ে দেবার জন্য বাবা-মা আছেনই, এখন কিন্তু তেমন হলে চলবে না। এখন আমাকে প্রতিটি কাজে পা বাড়ানোর আগে বহুবার ভাবতে হবে। প্রতিটি কাজ করতে হবে বহু চিন্তা করে। এখন আমার কাঁধে একজন মানুষের ভবিষ্যৎ। দায়িত্বের পালে খুব শীঘ্রই আরও একজন এসে যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

আগে আমি বাবার হোটেলে খেতাম। পরিবারের খরচের জোয়ালটা বাবাই টানতেন। এখন বাবাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে। বিশ্রাম না হোক, পরিবারের জোয়ালের একটু ভার এবার আমার কাঁধেও নিতে হবে।

এতদিন প্রত্যেক ঈদে আমার একাধিক নতুন কাপড় কিনতে হতো। এখন আমি পরিবারের দায়িত্বশীল একজন। সবার প্রয়োজন মেটাবার পর যদি সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্য নতুন কাপড় কিনব, অন্যথায় পুরোনো কাপড়েই ঈদ-আনন্দ ভাগাভাগি করতে হবে।

এতদিন পরিবারের ব্যাপারে হয়তো আমার কোনো হুঁশ-জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এখন বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'বাবা, তোমার ওষুধ আছে তো? না কি আনতে হবে?' মাকে বলতে হবে, 'মা, ঘরে চাল আছে তো? পেঁয়াজ দেখি শেষ প্রায়, আনা লাগবে নাকি?' পকেট ফাঁকা থাকুক সমস্যা নেই। প্রয়োজনে টাকার ব্যবস্থা তারাই করবেন, কিন্তু একজন দায়িত্বশীলের মতো আচরণ আপনাকে করতে হবে। দায়িত্ব পালনের পথে একটু একটু করে আগে বাড়তে হবে।

অন্যদিকে একজন নারীকে মনে রাখতে হবে, এখন আমি স্বামীর ঘর সামলাতে যাচ্ছি, আমি কেবল তার শয্যাসঙ্গিনী নই; বরং তার জীবনসঙ্গিনী। তার জীবনের সুখ-দুঃখগুলোর ভার আমাকেও কিছুটা বহন করতে হবে, তার অন্তরের কষ্টগুলোর উপশম আমায় করতে হবে।

এখন হয়তো শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হবে, সেখানে যারা রয়েছেন তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে। বাবার বাড়িতে হয়তো আপনি প্রিন্সেস ছিলেন। কেননা সেখানে আপনার কোনো ডিউটি ছিল না, সেগুলো আপনার মা সামলেছেন। এখন আপনার মায়ের অবস্থানই আপনি আরেকটি বাড়িতে নিতে যাচ্ছেন। কাজেই মা যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো আপনাকেও করতে হবে।

আগে যা মন চাইত তা-ই বাবার কাছে বা বড়দের কাছ থেকে চেয়ে নিতেন, কিছু থেকে কিছু হলেই অভিমান করতেন, গাল ফুলাতেন, এখন সে সুযোগ নাও মিলতে পারে।

স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে আপনাকে হতে হবে সতর্ক ও সচেতন, যেন অহেতুক কাজে তা ব্যয় হয়ে না যায়। আবার স্বামীর কাছে আবদার ও দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রেও তার সামর্থ্যের দিকে আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে। স্বামীর স্বাধীনতার

দিকেও সতর্ক খেয়াল রাখতে হবে। তাকে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যাবে না, আবার একদম অসচেতনও হওয়া যাবে না। এটা এমন এক গুরুদায়িত্ব, যেখানে বিপুল পরিমাণে নারী ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিছুদিন পর যখন মা হবেন তখন তো সন্তানের জন্য জীবনের অনেক সাধ-আহ্লাদই ত্যাগ করতে হবে। আসলে বিয়ের পর থেকেই কেউ আর ছোট্টটি থাকে না। বয়স যা-ই হোক, বিয়ে এমন এক দায়িত্ব, যা কাঁধে উঠার পর থেকে সবাই বড় হয়ে যায়, বড় হতে হয়।

এসব মানসিক প্রস্তুতি বিয়ের আগেই নিতে হবে। এ ছাড়া বিয়ের রঙিন স্বপ্ন দেখাকে ফ্যান্টাসিই বলে, যা বেশিদিন থাকবে না।

বিয়ে কোনো ফানুসের নাম নয় বা দিবাস্বপ্ন নয়। বিয়ে একটি ইবাদত। যেখানে জড়িয়ে থাকে পুরো পরিবারের হাজারও দায়িত্ব, আবেগ-অনুভূতি। আমার-আপনার একটি ভুল পদক্ষেপ, একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুরো পরিবারের ভোগান্তির কারণ হতে পারে।

বিয়ের পূর্বে অনেকেই থাকেন বেশ চড়া মেজাজের। কিছু হলেই বাসায় একচোট ঝড় তুলে দেন। আর সেই ঝড় থামে গিয়ে শোকেসের জিনিসপত্রের ওপর। মাঝে মাঝে মোবাইল বেচারাও এই ঝড়ের পাল্লায় পড়ে। বাসায় সবাই তাকে সমীহ করে কথা বলে। একমাত্র সন্তান, তাই একটু একগুঁয়ে টাইপের। তার আবদারগুলো ফেলা যায় নাকি! তাহলেই তো বাসায় তুলকালাম করে ফেলবে!

কিন্তু নাহ, আপনি শীঘ্রই বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাই এই মানসিক প্রস্তুতিও নিতে হবে যে, বিয়ের পর আগের মতো বাসায় ঝড় তোলা যাবে না। কথায় কথায় খেঁকিয়ে ওঠা যাবে না। জিনিসপত্র ভাঙচুর করা যাবে না। এখন হতে হবে স্থির, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। বিয়ের পর বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত সামাল দিতে হবে। কখনো কখনো বউ-মায়ের ঝগড়ার মাঝে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে হবে। উভয় পক্ষকেই শান্ত করতে হবে। তখন আপনার উল্টো রেগে গেলে চলবে না। তখন আপনি রেগে যাবেন তো হেরে যাবেন। একইভাবে মায়ে-ছেলেতে কিংবা বাবা-ছেলেতে ঝগড়া হলে একজন স্ত্রীকেও নিজের দায়িত্ব খুব সতর্কতার সাথে পালন করতে হয়; নয়তো এটাই এক বিশাল কলহের বীজ বপন করে দিতে পারে।

বিয়ের আগে বাসার কেউ আপনার কথায় বাধা হয়ে দাঁড়াত না। বা আপনার

কোনো আবদার উড়িয়ে দেবার সাহস করত না হয়তো; কিন্তু এখন মানসিক প্রস্তুতি নিন, হতে পারে আপনার বিবি আপনার চেয়েও একগুঁয়ে টাইপের। তার কথার হেরফের করলেই বাসায় আপনার ওপর ঝড় উঠতে পারে। আগে আপনি ঝড় তুলতেন শোকেসের জিনিসের ওপর, এখন ঝড় উঠতে পারে আপনার ওপর। মাঝে মাঝে বিবি রাগ করে বাড়ির দিকে হাঁটা দেবে, আবার মাঝে মাঝে তার অভিমান ছোটাতেই আপনার ঘাম ছুটে যাবে। তখন কী করবেন? রেগে যাবেন? রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারধোর শুরু করবেন? তাহলে আপনি হেরে গেলেন। নিজের নাম তাহলে ব্যর্থ স্বামীর খাতায় উঠে গেল। এসব সহ্য করার মানসিকতা এখনই নিতে হবে।

স্ত্রীদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে, সকল পুরুষ একধরনের হয় না। কেউ কেউ তো সামান্য অভিমান করলেই গলে যায়; কিন্তু এমন অনেক আনমনা পুরুষ রয়েছেন, যাদের ওপর অভিমান করলে আপনি যে অভিমান করেছেন সেটাই সে বুঝবে না, আপনার মনে হবে আপনি গাছের সাথে অভিমান করছেন। আবার অনেকের এমন মানসিকতাও রয়েছে যে, তার সাথে কেউ অভিমান করলে সে বোঝে না কী করবে। এমতাবস্থায় সে যা করে তা হলো, এড়িয়ে যাওয়া। সে ভাবে এড়িয়ে গেলে বিষয়টা আপনাআপনি থিতু হয়ে যাবে।

আসলে আল্লাহ তাআলা একেক মানুষকে একেক ফিতরাত দিয়ে বানিয়েছেন, এটাই মানবজাতির সৌন্দর্য। সে এমন কেন, অমুক তো এমন না, এমন করাটা যেন ঐশী কর্মের প্রতি একপ্রকার অভিযোগ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা যেভাবে ভালো মনে করেছেন ওভাবেই বানিয়েছেন।

তাহলে এমন লোকের সাথে মিলেমিশে কীভাবে থাকা যাবে? এটা আসলে ব্যক্তি-জীবনে ইজতিহাদের জায়গা। প্রত্যেককেই তার নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ইজতিহাদ বা গবেষণা করে বের করতে হয়।

তবে এ ধরনের অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, তাদের যদি বিষয়টা বুঝিয়ে বলা হয়, কষ্টটা শেয়ার করা যায়, তাহলে সমস্যা অনায়াসে মিটে যায়।

কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে যে, বাঙালি নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, আর যখন ফোটে তখন হয় বিস্ফোরণ। এটা সঠিক এপ্রোচ নয়; বরং শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং এর নীতিতে এগিয়ে আসতে হবে। নিজের কাউন্টার পার্টের

সাথে নিজের দুঃখ-কষ্টগুলো ধীরে-সুস্থে শেয়ার করে তার ভালোবাসা, আস্থা ও সহায়তাকে আদায় করে নিতে হবে।

আসলে আমাদের দেশে ছেলেদের একাধিক বিয়ে কিংবা মেয়েদের তালাকের পর পুনরায় বিয়ে এখনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। ফলে উভয় পক্ষের জীবনেই বিয়ের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে না। উভয়কেই বুঝতে হবে যে আমরা দুজনই আনাড়ি। ধীরে ধীরে শিখব ইনশাআল্লাহ। আর মানুষ তো ভুল করেই শেখে।

বিয়ের আগের জীবন ও পরের জীবন সম্পূর্ণই ভিন্ন। বিয়ের পরে মানুষকে নানা ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি হতে হয়। দুঃখ-পেরেশানি, অস্থিরতা এসে জীবনকে করে তুলতে পারে বিষাদময়। কিন্তু তখন আপনাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। যত বিপদই আসুক, আপনার থাকতে হবে সটান। এখন আবেগে টইটম্বুর হলে চলবে না। হতে হবে বাস্তবমুখী। পরিবারের কারও কথায় মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না, রাগ করে দরজা বন্ধ করে থাকা যাবে না, গতকালের মতো আজও আপনাকে মুখ বুজে কাজে যেতে হবে। শত কষ্ট চেপে হাসিমুখে কথা বলতে হবে।

মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতিটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি। কারণ, পুরুষ যত টাকাই আয় করুক না কেন, ঘর কিন্তু সামলে রাখেন ঘরের মেয়েরাই। পুরুষরা হলেন ঘরের ড্রাইভারের মতো, আর মেয়েরা হলেন সেই ঘরের ইঞ্জিন। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন গাড়ি চলবে না, ড্রাইভার ছাড়াও গাড়ি চলা অসম্ভব।

তাদের সবচেয়ে বড় মানসিক প্রস্তুতি হলো, এত বছরের চেনা পরিবেশ আর নিজ পরিবারকে দূরে রেখে নতুন এক পরিবেশে গিয়ে নতুন পরিবারকে আপন করে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি। তাদেরকেই এখন থেকে জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার বানিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি।

মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই বাসার সবচেয়ে আদুরে হয়ে থাকে। তাদের আবদারও থাকে বেশি। আবার কেউ কেউ বড্ড অভিমানীও হয়। কিন্তু বিয়ের পর এই মেয়েকেই অনেক আবদার পরিস্থিতি বুঝে মনের মধ্যেই চেপে যেতে হয়।

আগে হয়তো নিজের বাসায় এঁটো বাসনগুলোও ধরতে ঘেন্না হতো, এখন তাকে এসব তো পরিষ্কার করতে হবেই, ক'দিন বাদে সন্তানের মল-মূত্রও নিজহাতে সাফাই করতে হবে। অথচ বিয়ের আগে এর মানসিক প্রস্তুতি না-থাকার কারণে

অনেক মেয়েই শ্বশুরবাড়ি এসে ভেঙে পড়ে। মন খারাপ করে বসে থাকে। সবাই এমন তা নয়, অনেকেই ছোট থেকে ঘরের সব কাজ করা শিখে নেয়; তাদের জন্য বিয়ের পর সবকিছু মানিয়ে নেয়া অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

আবার অনেকের অভ্যাস হলো সকালে আটটার আগে ঘুম না ভাঙা। আটটার পর মা এসে টেনেটুনে ঘুম ভাঙান। এ নিয়ে বাসায় প্রতিদিন বকাঝকা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। কিন্তু বিয়ের পর এমন হলে চলবে না বোন, এখন ফজরের পর উনুনের আগুনটা প্রথমে আপনাকেই ধরাতে হবে। আগে হয়তো বাসায় বুয়া এসে কাপড়চোপড় ধুয়ে দিতেন। শ্বশুরবাড়ি তো বুয়া নাও থাকতে পারে, তখন নিজের কাপড়, স্বামীর কাপড়, প্রয়োজনে খেদমতের নিয়তে শ্বশুর-শাশুড়ির কাপড়ও ধুয়ে দিতে হবে।

বিয়ের পরে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি সহ্য করতে হয় তা হলো, শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন আত্মীয়দের কটুকথা। বাবার বাড়ি থেকে কী দিল? কে কে দেখতে আসল? রান্না এমন কেন? শরীর এত শুকনো কেন? মাথায় চুল কম কেন? বাবার বাড়ি এত যাওয়া লাগে না কি, বছরে একবার গেলেই তো হয়! এসব নানারকম কথা শুনতে হয় মুখ বুজে।

বাবার বাড়ির রাজকন্যা এখানে এসে হয়ে যায় ঘরের বউ। পার্থক্য এটাই যে, বাবার বাড়িতে তাকে মন জুগিয়ে চলতে হতো সবার। তার অভিমানের কাছে যেন রাজ্যের ক্ষমতাও নস্যি। কোনো কিছু চাওয়ার আগেই যেন তার সামনে তা হাজির করার জন্য সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেত। অথচ এখন এখানে তাকে চলতে হবে সবার মন জুগিয়ে। এখানে অভিমানগুলো সব আঁচলেই মুছে যায়। কত আবদার হারিয়ে যায় স্বামীর সামর্থ্য না-থাকার কারণে। এসব মেনে চলার জন্য বিয়ের আগেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার।

বোনেরা হয়তো লেখাগুলো পড়ে ঘাবড়ে যাচ্ছেন! ভাবছেন, সংসার-জীবন এত্ত কঠিন নাকি! কত রঙির ফানুস উড়ছে এখন মনের ভেতর বিয়ে-পরবর্তী জীবন নিয়ে!

মূলত কঠিন কিছু না, আবার সহজও নয়! এর সদুত্তর তো ঘরের মা-বড় বোনকে জিজ্ঞেস করলেই পাওয়া যাবে।

পার্থক্য শুধু এটুকুই, নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়া, পূর্বের অনেক

অভ্যাস, আবদার পরিবর্তন করে ফেলা। এটুকু যারা করতে পারে তাদের জন্য সংসার-জীবন সুখকর হয়ে যায়। আর যারা পারে না তাদের অনেকের জন্য সংসার-জীবন মৃত্যুতুল্যই।

এসব আলোচনায় হয়তো মনে হতে পারে, সব সন্তানই ঘরে খুব আদুরে পরিবেশে থাকে। আসলে তা নয়। আমরা স্বীকার করি, অনেক সন্তানও ঘরে নির্যাতিত হয়, এর পেছনে অনেক ফ্যাক্টরই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। সেই আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না; আমরা বরং ধরে নিচ্ছি এমন অনেক ভাই-বোন রয়েছেন, যারা তাদের পারিবারিক পরিবেশে নির্যাতনের শিকার। বিয়ের জন্য তাদেরও তো কিছু মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপার রয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রস্তুতির জন্য পূর্বের আলোচনা যথেষ্ট। এখানে শুধু সামান্য কিছু বিষয় অতিরিক্ত উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

কেউ কেউ নিজ পরিবারে জুলুমের শিকার হন, সে ক্ষেত্রে সে যদি পুরুষ হয় তাহলে বিয়ের আগেই তাকে মানসিকভাবে বুঝতে হবে, সে কি যাকে স্ত্রী করে আনছে তাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে, নাকি কেবল মাজলুমের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে? মনে রাখতে হবে, যাকেই বিয়ে করেন না কেন, ধরে নেয়া যায় বাকি জীবন তার সাথেই সংসার করতে যাচ্ছেন।

একজন নারী তার স্বামীর মাঝেই নিরাপত্তা খোঁজে, দুনিয়ার যেকোনো জুলুমের সামনে স্বামী হয় তার ঢাল। সেখানে স্বামী যদি নিজেই নির্যাতনের শিকার হয় কিংবা দেখা গেল স্ত্রীর প্রতি হওয়া পারিবারিক নির্যাতন কিংবা জুলুম প্রতিরোধের ন্যূনতম সামর্থ্য, চেষ্টা ও সদিচ্ছাও তার নেই, তখন সেই স্বামী স্ত্রীর চোখে ছোট হয়ে যায়। এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও পড়ে। সন্তানরা মায়ের কাছে বাবা ও তার পরিবারের অত্যাচারের দাস্তান শুনে বড় হয়। ফলে পিতা ও তার পরিবারের প্রতি একধরনের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা তাদের মাঝে তৈরি হয়, যা সহজে দূর হবার নয়।

এ জন্য আগেই বুঝতে হবে, আমি কি পারব আমার স্ত্রীকে সব রকম প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করতে? যদি এই পরিবার ও পরিবেশে তা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে আমার Plan B কী? এটা মাথায় রাখা উচিত। আর অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

অন্যদিকে যেসব মেয়েরা পারিবারিক পরিবেশে নির্যাতিত হন তাদের অনেকের মাঝেই আতঙ্ক বিরাজ করে, ফলে স্বামীর সাথে স্বাভাবিক হতে পারেন না। তাদের প্রতি পরামর্শ থাকবে, আতঙ্ক কমানোর চেষ্টা করুন, স্বামীকে আপন করে নিতে চেষ্টা করুন। আগেই একটা ধারণা মনে পোষণ করে বসবেন না; বরং আগে স্বামীগৃহে যান, অতঃপর সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

যাই হোক, এসব মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া যারা বিয়ে করতে চাচ্ছেন, তাদের কাজকে ফ্যান্টাসি না বলে আর কী বলার আছে!

# শারীরিক প্রস্তুতি

এই প্রস্তুতির বেলায় অবশ্য অনেকেই সচেতন থাকেন মাশাআল্লাহ। তবে পর্যাপ্ত ঘুম আর পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাপারে অনেকেই অবহেলা করেন। পর্যাপ্ত বলতে বেশিও না আবার কমও নয়। সুস্থ থাকতে হলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। পরিচিতদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি কেইস দেখেছি, বিয়ের পর স্ত্রী বেশি সময় ঘুমান। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই চান না। এক পরিবারে শুনলাম, সকালে ঘুমের কারণে তারা নাশতা বাইরে থেকে কিনে খান! এমন হলে কয়েক বছর পর স্থূলকায় হওয়া ছাড়া গতি নেই। অথচ উচিত ছিল বিয়ের পূর্বেই পর্যাপ্ত ঘুমের অভ্যাস করে নেয়া।

বেশি ঘুম ও বেশি খাবার মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়। হায়াতের বরকত কমে যায়, হায়াত কমে যায় না। হায়াত তো আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেই রেখেছেন। তবে একই সময়ে অন্যরা করতে পারে দশটি কাজ আর আমি করতে পারছি মাত্র পাঁচটি কাজ। এটাই জীবনে অনেক বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। ঘুমকাতুরে এবং পেটুক ব্যক্তি জীবনে সফল খুব কমই হয়। কারণ, সে কোনো কাজে মন বসাতে পারে না ঘুমের চাপে। আবার যে বেশি খায় সে কী খাব কী খাব তা চিন্তা করতে করতে বা বেশি খাওয়ার পর শরীরের আলস্য ভাব কাটাতে কাটাতেই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে।

এ ছাড়া ঘুমের সময় মেইন্টেইন করাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ও সময়মতো ঘুম মানুষের যৌন-জীবনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে। অথচ বর্তমানে ছেলেমেয়েরা একে তো অসময়ে ঘুমায়, তার ওপর ঘুমও পর্যাপ্ত হয় না। David A Kalmbach, Arnedt JT, Vivek Pillai ও Jeffrey A Ciesla 'The

impact of sleep on female sexual response and behavior' শিরোনামে একটি পাইলট স্টাডি করেছেন। যেখানে তাদের প্রাপ্তি হচ্ছে :

Obtaining sufficient sleep is important to the promotion of healthy sexual desire and genital response, as well as the likelihood of engaging in partnered sexual activity.[১১]

'স্বাস্থ্যকর যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যৌনাঙ্গের সাড়াদান বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একইভাবে সঙ্গীর সাথে যৌনকর্ম জাতীয় কাজ বৃদ্ধিতেও পর্যাপ্ত ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।'

কাজে বুঝতেই পারছেন, সঠিক মাত্রায় ঘুম বিবাহিত জীবনে কতটা গুরুত্ব রাখে। সারা বছর অসময়ে ঘুমাবেন, আপনাকে সারারাত ফেসবুকে অ্যাক্টিভ দেখা যাবে, আবার বিবাহিত জীবনে সুখী হবার আশা করবেন—এটা বোধহয় দুরাশাই হয়ে গেল। ব্যক্তি ও বিবাহিত জীবনে সুখী হতে এ জন্য আগে থেকেই ঘুমের টাইম-টেবিল মেইন্টেইন করা জরুরি।

বিশেষ করে রাত ১০টা থেকে ১১টা ঘুমন্ত থাকা অত্যন্ত জরুরি। এ সময়টাকে Golden hour of sleeping বলা হয়। এ সময়টা ঘুমানো হার্ট ও যৌনজীবনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। বিশেষ করে দ্রুত ঘুমানো যে শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী তা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত। যেমন একটি গবেষণা বলছে,

Sleep habits dictate health, wealth or wisdom, either for the good or the bad.

'স্বাস্থ্য, সম্পদ ও প্রজ্ঞা ভালো হবে না মন্দ এর ওপর ঘুমের অভ্যাস প্রভাব রেখে থাকে।'[১২]

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, দ্রুত ঘুমানো তো ছিল ইসলামের শিক্ষা; কিন্তু আমরা একে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এখন পশ্চিমারা গবেষণা করে দেখাচ্ছে যে, দ্রুত

---

১১. Kalmbach DA, Arnedt JT, Pillai V, Ciesla JA. The impact of sleep on female sexual response and behavior: a pilot study. J Sex Med. 2015 May; 12 (5) : 1221-32. doi: 10.1111/jsm. 12858. Epub 2015 Mar 16. PMID: 25772315.

১২. Mukamal, Kenneth J et al. 'Holiday review. Early to bed and early to rise: does it matter?' CMAJ: Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne vol. 175,12 (2006): 1560-2. doi:10.1503/cmaj.060745

ঘুমানোয় কত সুফল। সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের The University sleep Disorders Center এর আহমাদ এস. বাহাম্মাম 'Sleep from an Islamic perspective' নামে একটি গবেষণাপত্রই লিখেছেন।[১৩]

এতে ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুমের গুরুত্ব, ঘুমের প্রকার, দ্রুত ঘুমানো, ঘুমের আদব ইত্যাদি বিষয়ে খুব চমৎকার আলোচনা রয়েছে।

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা কুরআনে রাতের ব্যাপারে বলেছেন, রাত বানানোর উদ্দেশ্য হলো : لِتَسْكُنُوا فِيهِ 'যেন তাতে তোমরা তখন বিশ্রাম নিতে পারো।' আর দিনকে এভাবে বানিয়েছেন যে, وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا 'আর দিনকে বানিয়েছি দেখার জন্য।'[১৪]

অর্থাৎ এটা দিনের বৈশিষ্ট্য যে আমরা তাতে চোখ মেলে দেখব। অথচ এখন আমরা রাতের বেলায় জেগে থাকি, আর চোখ মেলে ডিভাইসের দিকে চেয়ে থাকি! এর ফলে আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাযি. বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পর আলাপ করা অপছন্দ করতেন।'[১৫]

ইশার পর অহেতুক আলাপ-আলোচনা তিনি এ জন্যই অপছন্দ করতেন যে, এর ফলে লোকে দেরিতে ঘুমাবে; সে ক্ষেত্রে কিয়ামুল লাইল আদায় করা সম্ভব হবে না, এমনকি ফজরের জামাত ও সালাতও ছুটে যেতে পারে।[১৬] আমরা বাস্তবেই দেখি যে অনেকেই এই সমস্যার শিকার। এ ছাড়া হাদীসের নিগূঢ় অর্থ হিসেবে

---

১৩. Bahammam AS. Sleep from an Islamic perspective. Ann Thorac Med. 2011;6(4):187-192. doi:10.4103/1817-1737.84771

১৪. সূরা ইউনুস, (১০) : ৬৭

১৫. ইমাম বুখারী রহ., আস সহীহ, হাদীস নং ৫৬৮

১৬. ইমাম শামসুদ্দীন আল-কিরমানী রহ., আল কাওকাবুদ দারারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী, ৪/২১১

আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্য হতেও দ্রুত ঘুমানোর উপকারিতা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

আমরা এখন দীর্ঘ সময় ধরে রাত জাগছি, ফলে সকালে ঘুমাচ্ছি, কিংবা ফজর পড়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছি; এর ফলে সকালের বরকত সময়ের বরকত আমরা পাচ্ছি না। অনেকেই বলেন, জীবনে ও সময়ে বরকত পাচ্ছি না। বরকত পাবেন কীভাবে? বরকতের সময় তো হেলায় নষ্ট করছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের জন্য সকালের বরকতের দুআ করেছেন। তিনি দুআ করেছেন,

اللهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

'হে আল্লাহ, আমার উম্মতকে সকালবেলায় বরকত দান করুন।'[১৭]

সুতরাং জীবনে ও সময়ে বরকত পেতে চাইলে এই উম্মাহকে কাজ করতে হবে সকালবেলায়। আপনার বাস্তবে জীবনের দিকে চেয়ে দেখুন, যেদিন ফজর পড়ে সজাগ থাকেন, কিছু আমল করে সকাল থেকেই কাজে লেগে যান, সেদিন কি মনে হয় না যে দিনটা অনেক বড়, আর কাজকর্মেও খুব বরকত হচ্ছে? বরকত পেতে চাইলে ফজরের পর ঘুমানোর অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং সকালবেলাটা কাজকর্মে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আমরা সেটা করছি কোথায়!

ঘুমের ক্ষেত্রে বদভ্যাসের ফল এমন হয়েছে যে, আমরা কারও কারও ব্যাপারে শুনেছি, স্বামী এবং স্ত্রীর ঘুমের শিডিউল এতই ভিন্ন যে, একজন জাগলে আরেকজন ঘুমায়! এমনটা যদি দীর্ঘদিন ধরে চলে, তাহলে ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।

একটি গবেষণা জানাচ্ছে যে, 'There is a positive correlation between the proportion of Internet access among families and insomnia in most areas.'[১৮]

অর্থাৎ, ইন্টারনেট এক্সেসের সাথে অনিদ্রা রোগের একটা পজিটিভ সম্পর্ক

---

১৭. ইমাম আহমাদ রহ., আল মুসনাদ, হাদীস নং ১৩২০, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে হাসান লি-গাইরিহ।

১৮. Y. Liu et al., 'Social Media Big Data-Based Research on the Influencing Factors of Insomnia and Spatiotemporal Evolution,' in IEEE Access, vol. 8, pp. 41516-41529, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2976881.

রয়েছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার অতি ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমাদের প্রজন্মকে একপ্রকার মোহিত করে ঘোরের মাঝে আটকে রেখেছে। ফলে তাদের মাঝে অনিদ্রা প্রকট হচ্ছে, এবং এর প্রভাব তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর পড়ছে।

আসলে এই বিষয়টার নেতিবাচক দিক নিয়েই একটা ভালো বই লেখা সম্ভব। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটুকু যে, আপনারা সতর্ক হোন। নিজের দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর এ জন্য পরিমিত ঘুমান এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করুন।

শারীরিক প্রস্তুতির বাকি বিষয়গুলো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে জেনে নেয়াই উত্তম।

# আর্থিক প্রস্তুতি

বিয়ের পূর্বে আর্থিক প্রস্তুতির ব্যাপারে অনেকেই গাফেল থাকে। আর্থিক প্রস্তুতি বলতে ইনকাম করতে করতে মধ্যবয়স পেরিয়ে বিয়ে করা নয়; বরং যতটুকু সম্পদ দিয়ে বিয়ের সময় মোহর ইত্যাদি এবং বিয়ের পর স্ত্রীর আবশ্যকীয় কার্যাদি সম্পাদন করা যায়, ততটুকুর প্রস্তুতি থাকতেই হবে।

সময়মতো বিয়ে-ভাবনায় ডুবে থেকে অনেকেই এই প্রস্তুতির কথা ভুলে যান। হ্যাঁ, এ কথা অনস্বীকার্য, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকের রিযিক তাঁর জিম্মাতেই রেখেছেন।

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

‘আর জমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলারই।’[১৯]

তবে আল্লাহ তাআলা স্বামীর ওপর স্ত্রীর কিছু হক ফরজ করে দিয়েছেন। এই যেমন পূর্ণ মোহরানা আদায় করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۝

‘আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।’[২০]

---

১৯. সূরা হুদ, (১১) : ৬
২০. সূরা নিসা, (৪) : ৪

আমাদের সমাজে মোহরকে ভাবা হয় জরিমানাস্বরূপ। অর্থাৎ বিয়ের সময় মোহর ধরা হয় দশ লক্ষ টাকা। নগদ আদায় করা হয় খুবই সামান্য। এরপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তখন তার থেকে পূর্ণ মোহর আদায় করা হয়। কেমন যেন দোকান ভাড়ার অ্যাডভান্সের মতো হয়ে গেল বিষয়টি। বেশি অ্যাডভান্সের ভয়ে দোকানদার যেমন দোকান ছেড়ে দেয় না, বিয়ের ক্ষেত্রেও ভাবা হয় বেশি মোহর ধরলে স্বামী তালাক দেবে না। অথচ এই ভাবনাটি মোটেই শরীয়তসম্মত নয়।

মোহর হলো স্ত্রীর হক। শরীয়তের নির্দেশ হলো মোহর ততটুকুই নির্ধারণ করা হবে যতটুকু দেয়ার সামর্থ্য থাকে। বেশি মোহর নির্ধারণ করে না দেয়ার চেয়ে সামর্থ্য পরিমাণ নির্ধারণ করে আদায় করে দেয়াই শরীয়তের বিধান। এবং মোহর আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। আদায় না করা পর্যন্ত এটা স্বামীর জিম্মায় ঋণ হিসেবেই থেকে যায়। ওপরে সূরা নিসার যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়—এক. আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে নারীদের মোহর দাও।' কিন্তু এখনকার বিয়েগুলোতে এত বেশি পরিমাণ মোহর ধরা হয়, যা আদায় করা হয় অনেক কষ্ট করে। সন্তুষ্টির কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, মোহর নির্ধারণ করার পর স্ত্রী যদি খুশিমনে তা থেকে কিছু মাফ করে দেয় এটা ভিন্ন ব্যাপার। তবে বর্তমানে বিয়ের প্রথম রাতে স্ত্রীকে মিষ্টি কথা বলে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি মোহর কমানো বা মাফ করানো হয়, এটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যে পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ের সময় মোহরানা নির্ধারণ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের খবর জানেন যে, তার তা আদায় করার নিয়ত নেই। ফলে সে আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে ওই নারীকে ধোঁকা দিল এবং তার লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ভোগ করল। এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ব্যভিচারী হিসেবে।'[২১]

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উত্তম সমাধান হলো, বিয়ের সময় স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা। হাদীসের মধ্যেও এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

---

২১. মুসনাদু আহমাদ, ১৮৯৩২; তাবারানী, মুজামুল আউসাত, ৬/২১০। হাদীস নং ৬২১৩; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ৫১৫৯। সনদ দুর্বল। ইমাম হায়ছামী রহ. বলেন, ইমাম আহমাদের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই। আর তাবারানীর বর্ণনায় অপরিচিত রাবী রয়েছেন। মাযমাউয যাওয়াইদ, ৭৫০৫।

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

'সবচেয়ে উত্তম মোহর হলো, যা আদায় করা সহজ হয়।'[২২]

অথচ আমাদের সমাজে সীমাতিরিক্ত মোহরকে গর্বের বিষয় ভাবা হয়। খুব গর্ব করে বলা হয়, আমার মেয়ের মোহর দশ লাখ টাকা!

আর বেশি মোহরের ভয় দেখিয়ে এভাবেই সমাজে সময়মতো বিয়েকে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যেসব ছেলেদের শারীরিক, মানসিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করতে দেরি হচ্ছে, এর পেছনে অন্যতম কারণ হলো মোহর আদায়ের ভয়। অথচ সমাজ যদি বিষয়টিকে সহজ করে দিত, তাহলে অনেকের বিয়েই সময়মতো হয়ে যেত। অবৈধ সম্পর্ক, যিনা-ব্যভিচার সয়লাবের পেছনে এটিই প্রধান ও অন্যতম কারণ যে—সময়মতো বিয়ে করতে না পারা। একজন পুরুষ যখন তার বিয়ের বয়সে পৌঁছবে, তখন যদি সে বিয়ে করতে না পারে, তাহলে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অবৈধ পথে তার চাহিদা পূরণ করা নিশ্চিত-প্রায়।

হাদীসের মধ্যে সীমাতিরিক্ত মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। উমর রাযি. বলেছেন,

> ألا لا تغالوا صدقةَ النساءِ . فإنها لو كانتْ مكرمةٌ في الدنيا أو تقوى عندَ اللهِ ، لكان أولاكُم بها نبيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم . ما علمتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نكحَ شيئا من نسائه ، ولا أنْكحَ شيئا من بناتهِ ، على أكثرَ من ثنْتَيْ عشرةَ أوقيةً
>
> 'সাবধান! তোমরা স্ত্রীদের মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন কোরো না। কেননা সীমাতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করা যদি দুনিয়াতে গর্বের বিষয় অথবা তাকওয়ার বিষয় হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এর সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিয়ের ক্ষেত্রেও কখনো

---

২২. মুসতাদরাকু হাকীম, হাদীস নং ২৭৪২। ইমাম হাকীম রহ. বলেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. এই মতটিকে সমর্থন করেছেন। তাবারানী, আউসাত, ১/৩৮৯, হাদীস নং ৭২৪।

> বারো উকিয়ার বেশি মোহর নির্ধারণ করেননি এবং তাঁর মেয়েদের বিয়ের বেলায়ও বারো উকিয়ার বেশি মোহর নির্ধারণ করেননি।[২৩]

এক উকিয়া = ৪০ দিরহাম।[২৪]

সে হিসেবে ৪৮০ দিরহাম হয়।[২৫] আর এক দিরহাম হচ্ছে ৩ গ্রাম ৬১ মিলিগ্রাম রুপা।[২৬] সে হিসেবে হয় ১৭৩২.৮ গ্রাম রুপা। বাজার মূল্য অনুযায়ী রুপার দাম কমবেশি হবে।

তাই বিয়ের সময় মোহর সহজ করা অন্যতম সুন্নাহ। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় যদিও এটা নয়, তবুও কথাপ্রসঙ্গে তুলে ধরা হলো। আমাদের মূল কথা হলো, ধরে নিলাম আপনার বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়ানো হয়নি; কিন্তু আপনার কি এখনো সেই প্রস্তুতি আছে যে, নিজের টাকায় বিয়ের মোহর আদায় করবেন? না কি এটার জন্যও বাবার গাঁটের দিকে তাকিয়ে আছেন!

এ জন্য বিয়ের আগে যতটা পারা যায় আর্থিক প্রস্তুতি নেয়া উচিত। অন্তত বিয়ের দু-বছর আগ থেকে টাকা-পয়সা জমা করতে হবে। এটা হোক আপনার টিউশনির টাকা জমিয়ে, বা পড়ালেখার পাশাপাশি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে টাকা জমিয়ে। ছেলেরা এখন বিয়ের আগে হাতখরচ করেই অনেক টাকা খরচ করে ফেলে। বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন ট্যুরে গিয়ে হাজার দশেক টাকা খরচ করার চেয়ে তা থেকে পাঁচ হাজার টাকা বিয়ের জন্য জমালে তো দিনশেষে আমারই লাভ। বিয়ের সময় আমার হাতে যদি অন্তত এক লাখ টাকা থাকে, তাহলে তা দিয়ে স্ত্রীর আংশিক মোহর, কিছু কেনাকাটা করা যাবে অনায়াসেই।

কথাপ্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় তুলে ধরি। অনেকেই ভাববেন, এক লাখ টাকায় তো কিছুই হবে না। এটা তো শুধু বিয়েবাড়ির গেটের আলোকসজ্জাতেই চলে যাবে। গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত আলোকসজ্জা, পুরো বাড়ি একটানা কয়েক দিন পর্যন্ত ঝাড়বাতি দিয়ে সাজিয়ে রাখা, বিয়ের রাতে ব্যান্ডপার্টি করা, কমিউনিটি

---

২৩. তিরমিযী, হাদীস নং ১১১৪; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৫৪৪। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ।

২৪. হাশিয়াতু ইবনি আবিদীন, ১/১৩২; ফাতহুল কাদীর, ১/৫২০; মুগনিউল মুহতাজ, ১/৩৮৯; আল মুগনী, ৬/৬৮২

২৫. ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ., মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/২১০০

২৬. মুফতী আবুল কালাম শফিক আল কাসিমী, আল আওযানুল মাহমুদাহ, পৃষ্ঠা ৭০

সেন্টার ভাড়া করে হাজার পাঁচেক লোকজনকে হরেক রকম দামি দামি খাবার খাওয়ানো, মেয়ের কসমেটিক্স আর পোশাক-আশাক কিনতেই কয়েক লাখ টাকা খরচ করা, বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে কয়েক লাখ টাকা দামের লেহেঙ্গা বানিয়ে আনা—এমন অসংখ্য খরচের ফর্দ তো এখনো বাকিই রয়ে গেল! বিয়েতে ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা খরচ না করলে বিয়ে হয় নাকি! সমাজে মুখ দেখাব কী করে! অথচ বিয়ের খরচের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন আগে তা একটু দেখি :

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

'সবচেয়ে উত্তম হলো ওই বিয়ে, যে বিয়ে সবচেয়ে সহজে হয়।'[২৭]

অর্থাৎ যে বিয়েতে খরচ কম হয়, যে বিয়েতে মেয়ের বাবার কোনো চিন্তা থাকে না, যে বিয়েতে ছেলের সীমাতিরিক্ত মোহরের ভয় থাকে না, ওই বিয়ে সবচেয়ে উত্তম। আর ওই সংসারেই সবচেয়ে বেশি বরকত থাকে।

আর যে বিয়ে শুরুই হবে অশ্লীলতা আর অপচয় দিয়ে, যে বিয়েতে শত শত লোকের খাবার অপচয় হবে, রাতভর উচ্চ আওয়াজে গান-বাজনার মাধ্যমে প্রতিবেশী অসংখ্য লোককে কষ্ট দেয়া হবে, যাদের মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিও রয়েছেন; যেখানে পর্দার কোনো বালাই থাকবে না, পদে পদে শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করা হবে, যেখানে বউকে পণ্যের মতো সাজিয়ে স্টেজে সবার সামনে প্রদর্শন করা হবে আর দলে দলে নারী-পুরুষ এসে দেখতে থাকবে, সুযোগসন্ধানী কোনো যুবক আবার অশালীন মন্তব্যও করে বসবে, ওয়েডিং ফটোগ্রাফির নামে বেহায়াপনার চূড়ান্ত করা হবে, যে বিয়েতে যৌতুক নামক কুপ্রথার মাধ্যমে মেয়ের বাবাকে জুলুম করা হবে, এমন সংসারে সুখ-শান্তি আসবে এটা কল্পনা করাও তো দুষ্কর! কারণ এটা তো সুস্পষ্ট বিষয়, একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবিধানেই রয়েছে দুনিয়া-আখেরাতের সুখ-শান্তি ও সফলতা। এ ছাড়া অন্য কোনো মতাদর্শ, জীবনবিধান বা ইজমে সাময়িক সুখ-শান্তির ছায়া দেখা দিলেও দিনশেষে তা মরীচিকা হয়েই ধরা দেবে।

---

২৭. সুনানে আবু দাউদ, ২১১৭; মুসতাদরাকে হাকীম, ২৭৪২। সহীহ। ইমাম হাকীমের বর্ণনায় মোহরানার উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বিয়েকে সহজ করেছেন মানুষ যাতে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্য প্রয়োজনসাপেক্ষে পুরুষদের চারটি বিয়েরও অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বিয়েকে করেছি কঠিন, ফলে মানুষ বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও বিয়ের বাজারে সামর্থ্যবান না হওয়ার কারণে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এদিকে একাধিক বিবাহকে সামাজিক দৃষ্টিতে জঘন্যতম ও ঘৃণ্য অপরাধ বানিয়ে ফেলায় কারও একাধিক বিয়ের প্রয়োজন হলেও সে করতে পারছে না। ফলে বিয়ের পরও সে জড়িয়ে পড়ে পরকীয়া বা ব্যভিচারের মতো গর্হিত কাজে।

বিবাহের পর থেকেই স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য যেসব অধিকার সাব্যস্ত হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো স্ত্রীর ব্যয়ভার গ্রহণ করা। তাই বিয়ের আগে আমার এ ব্যাপারেও পূর্ণ প্রস্তুতি থাকা চাই। এতদিন আমি ছিলাম অন্যের ওপর নির্ভর করে, এখন আমার কাঁধে আরেকজনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব শ্বশুরবাড়ি থেকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়নি; বরং এটা আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'আরও বিধি মোতাবেক পিতার কর্তব্য হলো, (নিজ সন্তানের) মায়েদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করা।'[২৮]

হাদীস শরীফে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন—'তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে তাকেও পরাবে। চেহারায় কখনো প্রহার করবে না, অসদাচরণ করবে না।'[২৯]

এ ব্যাপারে ফতওয়ার কিতাবাদির বক্তব্য হলো, ভরণপোষণের ব্যাপারে শরীয়ত নিরেট পরিমাপ নির্ধারিত করে দেয়নি; বরং ইসলামী শরীয়তের ভাষায় স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণপোষণ দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এর পরিমাণটি পরিবেশ-পরিস্থিতি, অবস্থা ও স্বামীর সামর্থ্যনির্ভর।[৩০]

বিয়ের পর স্ত্রী যদি আলাদা ঘর দাবি করে, তাহলে তাকে আলাদা ঘরে রাখতে

---

২৮. সূরা বাকারা, (০২) : ২৩৩

২৯. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪২। সনদ হাসান। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১৮৫০১

৩০. আল মুহিতুল বুরহানি, ৩/৫২৯-৫৩০; ফাতহুল কাদির, ৩/১৯৪

হবে, এটা তার অধিকার। হ্যাঁ, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বাবা-মায়ের সাথেই রাখতে পারে, তাহলে কথা ভিন্ন। এ ব্যাপারে ফতওয়ার কিতাবাদির বক্তব্য হলো, স্ত্রী যদি উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়, আর সে যদি স্বামীর যৌথ পরিবার থেকে ভিন্ন ঘরের দাবি করে, তাহলে স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। স্বামীর মা-বাবার সঙ্গে যৌথভাবে থাকতে স্ত্রী বাধ্য নয়। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সঙ্গে এক ঘরে রাখা গেলেও তার পৃথক কক্ষ, টয়লেট, গোসলখানা, রান্নাঘরসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস ভিন্ন করারও দাবি করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও স্বামীর পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে থাকতে স্ত্রীকে বাধ্য করা যাবে না। আর নিম্নবিত্ত পরিবারের হলে টয়লেট, গোসলখানা রান্নাঘর ইত্যাদি ভিন্ন দিতে বাধ্য না হলেও তার জন্য একটি পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে; যাতে স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ওই কক্ষে স্বামীর মা-বাবা, ভাই-বোন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। স্ত্রীর এ রকম কক্ষ দাবি করার অধিকার আছে।[৩১]

স্ত্রীর ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করার মাঝে তার একান্ত জিনিসপত্রগুলো আলাদা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবও পড়ে। এমন ঘটনাও শুনেছি যে স্ত্রীর জন্য পোশাক ও গোপন জিনিস রাখবার জন্য আলাদা একটা আসবাবও স্বামী দেয়নি; ফলে আর সবার সাথে একই আসবাবে এ সবকিছু রাখতে হয়েছে! একজন নারীর জন্য এটা কতটা লজ্জাকর তা তো ভাষায় প্রকাশিত্য নয়।

তাই বিয়ের আগে আর্থিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, বিয়ের পর প্রয়োজন হলে বিবিকে যাতে আলাদা বাসস্থানে রাখা যায়। যদি বাবা-মায়ের সাথে একসাথেই রাখা যায়, তবুও তো তার প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। নাকি এর জন্যও বাবার কাছে হাত পাতবেন? এখানে আরেকটি কথাও স্মর্তব্য যে, ভরণপোষণের অর্থ শুধু এটিই নয় যে, শুধু তাকে তিনবেলা খানা আর কাপড়-চোপড় ও থাকার ঘর দিলাম; বরং তাকে মাঝেমধ্যে প্রয়োজন পরিমাণে সামান্য হাতখরচও দেয়া জরুরি। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, এমন কিছু প্রয়োজন, যা কারও কাছে চাইতে ইতস্ততবোধ হয়, তখন হাতখরচের টাকা দিয়ে পূরণ করতে পারবে। তাই স্বামীর এ ব্যাপারেও সচেতন হওয়া উচিত।[৩২]

---

৩১. বাদায়েউস সানায়ে, ৪/২৩; রদ্দুল মুহতার, ৩/৬০১

৩২ বীবী কে হুকুক, পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর মতে এ জন্য স্ত্রীকে প্রতিমাসে কিছু হাতখরচ দিতে হবে, যা তার আবশ্যক نفقة বা খোরপোশের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে।

বিয়ের আগে টানা কয়েক দিন পকেট-শূন্য থাকলেও গায়ে লাগে না; কিন্তু বিয়ের পর পকেট-শূন্য অবস্থায় কয়দিন চলা যাবে! বিয়ের পর দেখবেন কত দ্রুত মাস শেষ হয়ে যায়, কত দ্রুত ঘরের বাজার ফুরিয়ে যায়। তখন পকেট-শূন্য থাকলে প্রিয়তমার মিষ্টি হাসিও বিষের মতো লাগে। দেখতে দেখতে সন্তান আসবে সংসারে। দেখবেন আপনি বাবাও হয়ে গিয়েছেন। আসলে তা না; বরং আপনি সংসারের জালে পুরো জড়িয়ে গেলেন। অনেক খরচ আর দায়-দায়িত্ব আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। বাচ্চার খাবার একসময় বোঝা মনে হবে। দুধের এত দাম কেন? আরও কমদামি দুধ খাওয়ালে কী হয়—এসব মনে মনে ভাববেন। কাউকে বলাও কঠিন। কিন্তু এই ভাবনা কেন আসবে? কারণ, আপনার পকেট ফাঁকা। অথচ ঘড়ি ক্যালেন্ডারকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মূলকথা, বিয়ের আগে ইনকাম করুন। পর্যাপ্ত ইনকাম করুন। আয়-রোজগারের পথ খুলে এরপর বিয়ে করুন। অন্যথায় বিয়ের পর বেকার বসে থাকলে ঘরের প্রিয়তমাও একপর্যায়ে আপনাকে অসহ্য মনে করবে। টাকার চিন্তায় ধীরে ধীরে আপনার ভেতর থেকে আমল ছুটে যাবে। তখন আর বিবিকে নিয়ে একসাথে কুরআন তিলাওয়াত, শেষরাতে তাহাজ্জুদ আর বারান্দা-বিলাস ভালো লাগবে না। শীতের কুয়াশা ভেজা সকালে একসাথে হাঁটতেও ইচ্ছে করবে না। তখন শুধু চিন্তা থাকবে ঘরে চাল নেই, তেল নেই, বাচ্চার ওষুধ নেই। কীভাবে এসবের ব্যবস্থা করা যায়।

শায়খ হোসাইন আবদুস সাত্তার হাফি. বলেন, 'যদি আপনার সম্পদ না থাকে, আপনার টাকা বা যথেষ্ট সংস্থান না থাকে, তাহলে এইভাবে এক-দুই সপ্তাহ চলার পর প্রথমে যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা হচ্ছে আপনার দ্বীন। যখন আপনার টাকা থাকবে না, তখন আপনার টেবিলে খাবারও থাকবে না। আপনি খাবার খুঁজতে যাবেন এবং যেকোনো উপায়ে তা জোগাড় করবেন, সেটা হারাম পথে হলেও এমনকি আপনি চুরিও করতে পারেন। তাই দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে এমন সম্ভাবনা এড়িয়ে চলতে হবে। তাই সঞ্চয় করতে হবে।'

কেবল ইনকাম করতে গাফলতি করার ফলস্বরূপ অসংখ্য মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়। তখন দ্বীনী রোমান্স ছড়ানো ইসলামী গ্রুপ আর বইও অসহ্য লাগে।

অনেকেই আবার অভিযোগ করে থাকেন, অমুক ব্যক্তি দ্বীনদার হওয়া সত্ত্বেও তার মেয়ে বা বোনকে বেকার ছেলের কাছে বিয়ে দিতে চান না। তার মধ্যে তাওয়াক্কুল নেই ইত্যাদি নানা অভিযোগ করা হয়। অথচ দেখা যাবে, অভিযোগকারী ব্যক্তি নিজেই তার মেয়ে বা বোনের বিয়ের ক্ষেত্রে একটা ভালো, সচ্ছল ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার খোঁজে। যে পরিবারে গিয়ে তার মেয়ে বা বোন খুব অর্থকড়ির মাঝে না থাক, অন্তত প্রয়োজন পরিমাণ জীবনধারণ যেন সে করতে পারে। আর এমনটা আশা করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয় মোটেই।

আলী রাযি. যখন ফাতিমা রাযি.-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟

'(তাঁকে দেবার মতো) তোমার কাছে কিছু আছে কি?'[৩৩]

তাঁর কাছে তেমন কিছু না থাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে, তাঁকে তিনি একটি বর্ম দিয়েছিলেন, সেটা বিক্রি করা যায়। অন্যদিকে আলী রাযি. পরিকল্পনা করেছিলেন যে, ঘাস কেটে উট দিয়ে বহন করে নিয়ে তা বিক্রি করে টাকা উপার্জন করবেন। তখনো মদ হারাম হয়নি, আসাদুল্লাহ হামযাহ রাযি. একদিন মদ্যপ অবস্থায় সেই উটকে জবাই করে ফেলায় এই পরিকল্পনা সফল হয়নি।[৩৪]

এখান থেকে যেমন একজন পাত্রীর সফল পিতার চিন্তা চিত্রিত হয়, তেমনি একজন সফল স্বামীর পরিকল্পনা ও প্রয়াসকে দেখা যায়।

আমাদের সমাজব্যবস্থা একজন বেকার, টিউশন পড়ানো, ফ্রিল্যান্সার ছাত্রের কাছে বিয়ে দিতে এখনো প্রস্তুত না। ছেলেপক্ষ যেমন প্রস্তুত না, মেয়েপক্ষও তেমন প্রস্তুত না। শুধু 'দ্বীনদার' যোগ্যতাটি সমাজের কাছে বিয়ের জন্য যথেষ্ট না। সমাজ চায় প্রতিশ্রুতি। সমাজ বলবে, আমরাও তো দ্বীনদার, আমরাও তো

---

৩৩. ইমাম আহমাদ রহ., আল মুসনাদ, হাদীস নং ৬০৩, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে হাসান লি-গাইরিহ।

৩৪. ইমাম ইবনু কাসির রহ., আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩০৬

নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, কুরআন তিলাওয়াত করি, দান-সদকা করি। তুমি এমন কোন দ্বীনদার যে, তোমার কাছে বিয়ে দেব? বা ওই মেয়েকেই বিয়ে করতে হবে? তোমার মধ্যে কী এমন ম্যাজিক আছে?

সমাজের এই প্রশ্নের জবাবে আপনি তো বলতে পারবেন না, আমি তাহাজ্জুদ পড়ি, নফল রোজা রাখি। আমি দ্বীনদার, আমার কাছে বিয়ে দিন। বিয়ের বাজারে এই আবদার মেনে নেবার মতো তো না-ই, উল্টো হাস্যকর।

বিয়ের আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবারের কাছে ভাইভা পরীক্ষা দেয়া। নিজের পরিবারের কাছে কোনো মাধ্যম দ্বারা বা সরাসরি নিজে যখন বিয়ের কথা তুলবেন, তখন একটি ভাইভার জন্য প্রস্তুতি নিন। পৃথিবীর সবাইকে বোঝানো সহজ, নিজের পরিবারকে বোঝানো সহজ না। তারা আপনার কথা কেন মেনে নেবে? তারা তো এখনো আপনার চেহারার দিকে তাকালে আপনার ছোট্টবেলার ছবিটি ভেসে ওঠে! যতই বড় হোন না কেন, পরিবারের চোখে আপনি শিশুই থাকবেন।

একটি ভাইভা বোর্ডে যেমন কিছু ডকুমেন্ট দেখাতে হয়, বিয়ের কথা তোলার পর নিজের পরিবারকেও এটা বোঝাতে হবে যে, 'আই অ্যাম সিরিয়াস।' পরিবার জানতে চাইবে, 'এখনো তোর হাতখরচের টাকা আমাদের কাছ থেকে নিতে হয়, বিয়ের আয়োজন কীভাবে করবি, দেন-মোহর কীভাবে দিবি, বিয়ে করে বউকে কী খাওয়াবি?'

আপনি যদি সত্যিই বিয়ে করতে আগ্রহী থাকেন, তাহলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। টিউশনের জমানো টাকা বা কোনোভাবে উপার্জিত টাকা আপনার হাতে অবশ্যই রেখে তারপর পরিবারের কাছে যেতে হবে। হতে পারে সেটা মোটামুটি একটা অ্যামাউন্টের টাকা, যেটা দেন-মোহরের জন্য বরাদ্দ। ধরুন সেটা ৫০ হাজার বা ১ লাখ। অথবা আপনি এখন এই পরিমাণ আয়-রোজগার করছেন, যা দিয়ে আপনি অন্তত আপনার স্ত্রীকে মোটামুটি চালাতে পারবেন। যদি এটা না পারেন তাহলে শুধু-শুধু 'বাবা, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বলে আস্ফালন করে লাভ নেই।[৩৫]

---

৩৫. টাকা জমাতে গিয়ে অনেকে ভুলে যান যে, নিসাব পরিমাণ অর্থ জমে গিয়ে এক বছর হাতে থাকলে কিন্তু সে টাকাতেও যাকাত দিতে হয়। এটা খেয়াল রাখতে হবে।

যদিও আমরা কেবল বাস্তবতাকেই তুলে ধরলাম, তবু আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, উপার্জন করব কীভাবে? আসলে আমাদের অনেক ভাই যেভাবে বিয়ে করতে উদ্‌গ্রীব থাকেন, সেভাবে উপার্জনের পন্থা অন্বেষণ করতে ও সে মোতাবেক কাজ করতে ততটা আগ্রহী থাকেন না।

এই মানসিকতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। অবশ্য এটাও সত্য যে অনেক পরিবারে এমন হয়, ছেলে উপার্জন শুরু করলে বাবা-মা উল্টো দাবি করেন যে, পরিবারে দিতে থাকো, বিয়ের বয়স হয়নি। বিশেষ করে সংসারের বড় ছেলের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আবদারই থাকে, আগে ছোটগুলোর গতি হোক, তারা বড় হোক, পড়াশোনা শেষ হোক, এরপর বড়টার গতি হবে নাহয়। তারা চায় ততদিন পর্যন্ত বড় সন্তান সংসারের আর্থিক চাহিদা জোগান দিতেই থাকবে।

এর মাঝে তার জীবনের কী অবস্থা হলো সেটা দেখার সময় কোথায়? আমার পরিচিত এক ব্যক্তির কথা জানি, যিনি এসব করতে করতে ৪০ বছর পেরিয়ে যাবার পর বিয়ের সুযোগ পেয়েছেন। আরেকজনের কথা জানতাম, যিনি ৪৫ বছর পার হবার পর বিয়ে করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব দুঃখজনক বাস্তবতাও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।

আসলে আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের পাশাপাশি আপনার মাঝে দৃঢ়তা থাকতে হবে, যেন আপনি নন; বরং পরিবার নমনীয় হতে বাধ্য হয়। যদি সেটা না হয়, তাহলে সময় ও সুযোগ মোতাবেক ভিন্ন জায়েয পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তবে এর আগে চেষ্টা তো চালিয়ে দেখতে হবে।

পেছনের কথায় আবার ফিরে আসি—ছাত্রাবস্থায় উপার্জন কীভাবে করা যায়? আসলে এর জন্য তো বর্তমানে অনেক পথ ও পন্থা খোলা রয়েছে। বিভিন্নজনের সাথে কথারার্তা বললে ইনশাআল্লাহ অনেক পথ এমনিতেই খুলে যাবে। আমরা কেবল ধারণা দেবার জন্য কিছু পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি। যেমন :

১. টিউশনি করা।

২. অনলাইনে আর্টিকেল লেখা।

৩. ব্লগ তৈরি করা।

৪. ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা।

৫. প্রুফরিডিং করা।

৬. অনলাইনে বা অফলাইনে ছোটখাটো ব্যবসা করা।

৭. রাইড শেয়ারিং।

৮. SEO strateging.

৯. Affiliate marketing.

১০. Data entry.

১১. App development ইত্যাদি।

আসলে ফ্রিল্যান্সিং ধাঁচের যত উপার্জন রয়েছে এগুলোর সমন্বিত সেক্টর অনেক বড়। আপনি যদি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম Upwork এ ঢোকেন, দেখবেন সেখানে শতাধিক ধরনের জব রয়েছে। এ রকম আরও বহু প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

তবে এ ধরনের কাজের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ আপনাকে নিতে হবে :

১. নিজে বিভিন্ন কাজ খুঁজুন।

২. যেগুলো পছন্দ হবে সেগুলো সম্পর্কে ইউটিউব ও গুগলে সার্চ করে একটা ধারণা পেতে চেষ্টা করুন।

৩. আপনি এটা করতে পারবেন কি না যাচাই করুন।

৪. অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন।

৫. সব মিলে গেলে শেখা শুরু করুন কোনো উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে। অনলাইনে এখন প্রচুর কোর্স পাওয়া যায়, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব, তবে সরাসরি কারও কাছে শেখার বিকল্প নেই।

Coursera বা অন্যান্য অ্যাকাডেমির পেইড কোর্সগুলো বেশ উপকারী। যদি টাকার অভাবে করতে না পারেন, তাহলেও হতাশ হবার কিছু নেই, একটু খোঁজাখুঁজি করলে অনলাইনে অনেক ফ্রি ম্যাটেরিয়াল ও রিসোর্স পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

৬. শেখা হয়ে গেলে উপার্জনের গাইডলাইন কারও থেকে নিয়ে বা খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী কাজ শুরু করুন।

মনে রাখবেন, দুনিয়ার কোনো কাজই শর্টকাটে হয় না। যে কাজই শিখুন না কেন একাগ্রতার সাথে নিয়মানুবর্তী হয়ে শিখুন। আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ এটা বাকি জীবনের জন্যও ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

আমি অনেককে দেখেছি, যারা বিভিন্ন কাজ শিখেছেন, কিন্তু পরে উদাসীনতার কারণে উপার্জন করতে পারেননি। আবার এমন লোকও দেখেছি, খুব সাধারণ মানের কাজ করলেও নিয়মানুবর্তিতা তাঁকে উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

আর হ্যাঁ, অবশ্যই যে কাজ করে উপার্জনের চেষ্টা করবেন সেটি হালাল কি না তা এই বিষয়টি বোঝে এমন কোনো মুফতী সাহেবের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। কষ্ট করে হারাম পয়সা কামানোর তো কোনো মানে হয় না।

অনলাইনের বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি অফলাইনের কথাও কিন্তু লিস্টে ছিল। খুঁজলে দেখবেন অফলাইনেও করার মতো অনেক কাজ রয়েছে; হয়তো খুব সাধারণ কাজ, কিন্তু উপার্জন এনে দেবার মতো; কিন্তু বেখেয়ালে আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি।

# কুফু মিলিয়ে বিয়ে করা

বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমতা না হওয়ার কারণে পরবর্তীতে অনেক পরিবারেই মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি কখনো কখনো তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়।

আরবী 'কুফু' শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য, সমকক্ষ, সমতুল্য ইত্যাদি। বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের রুচি, চাহিদা, বংশ, যোগ্যতা সবকিছু সমান সমান বা কাছাকাছি হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় কুফু বলে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রুচি, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান খুব বেশি ভিন্ন হলে সেখানে সুখী দাম্পত্য-জীবন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন উচ্চ শ্রেণির ছেলেমেয়ের চাহিদা-রুচির সাথে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের রুচিবোধের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। যে মেয়ের বাসায় এতদিন এসির পানিই মুছে দিত কাজের বুয়া, সেই মেয়ে এখন আপনার ঘরে এসে টিনের চালের ফাঁক গলে পড়া পানি মুছতে বিব্রতবোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। যে মেয়ে সপ্তাহে একাধিকবার গোশত খেয়েছে, সে এখন আপনার ঘরে মাসান্তরেও গোশত না পেলে কষ্টে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আবার একজন দ্বীনদার পাত্রপাত্রীর সাথে দ্বীনের বিষয়ে উদাসীন পাত্রপাত্রীর জীবনাচার নাও মিলতে পারে। দ্বীনদার চাইবে সবকিছুতে ধর্মের ছাপ থাকুক। তার ঘর সব সময় কুরআন-সুন্নাহর আলোয় আলোকিত থাকুক। তার ঘর থেকে ভোরের মৃদু হাওয়ায় কুরআনের সুমিষ্ট আওয়াজ বয়ে যাক। আর দ্বীনহীন চাইবে সবকিছু ধর্মের আবরণমুক্ত থাকুক। পর্দা নামক কোনো 'বন্দীত্ব' না থাকুক। সকালে সে নয়টার আগে ঘুম থেকে উঠতে চাইবে না। সুতরাং এ দুইয়ের একত্রে

বসবাস কখনো শান্তি-সুখের ঠিকানা হতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআনও বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীর বিষয়ে সমতা রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۬ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

'দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকেরা যা বলে, তারা তা থেকে মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।'[৩৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের ওপর এটা হারাম করা হয়েছে।'[৩৭]

এই আয়াতের শেষাংশে মুমিনদের ওপর হারাম করা হয়েছে কথাটির উদ্দেশ্য হলো, মুমিনদের ওপর মুশরিক নারীদের বিবাহ হারাম করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী যদি তওবা করে তার কুকর্ম থেকে ফিরে না আসে, তবে তাকেও বিয়ে করা জায়েয নেই।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেউ কেউ বেপর্দা ও দ্বীনবিমুখ মেয়েকে বিয়ে করতে চান এটা ভেবে যে, বিয়ের পর তাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন মানুষটাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে উল্টো নিজেই দ্বীনহারা হয়ে যেতে হয়। এর প্রধানতম কারণ হলো, নিজের ঈমান-আমল তেমন সবল না হওয়ার কারণে দ্বীনহীন মেয়েকে ঘরে এনে একপর্যায়ে নিজেরই দ্বীন হারিয়ে যায়। এ জন্য নিজের ও পরিবারের ঈমান-আমলের হালত যদি সবল না থাকে, তাহলে এমন মেয়েকে বিয়ে না করাই

---

৩৬. সূরা নূর, (২৪) : ২৬

৩৭. সূরা নূর, (২৪) : ৩

উত্তম। আর শরীয়ত কুফু মেলানোর ক্ষেত্রে সম্পদ ও বংশমর্যাদার চেয়ে দ্বীনকে আগে রেখেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

'(মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়—নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা রূপ-সৌন্দর্য, অথবা তার ধর্মভীরুতার কারণে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) সুতরাং ধর্মভীরুকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করে সফল হও। আর যদি এরূপ না করো, তাহলে তোমার দু-হাত ধুলায় ধূসরিত হোক (ধর্মভীরু মহিলাকে প্রাধান্য না দিলে ধ্বংস অবধারিত)!'[৩৮]

অন্যদিকে একদম দ্বীনহীন ছেলেকে বিয়ে করলে একটি মেয়েও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। দেখা যাবে সে হালাল-হারামের বাছবিচার করে না, মেয়ের পর্দা নিয়মিত লঙ্ঘিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেটা হলো মেয়েরও তো উচিত ছেলেদের মতো পরিপূর্ণ প্র্যাক্টিসিং দ্বীনদার একজন ছেলেকে বিয়ে করা। কিন্তু আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা এমন যে, অনেক দ্বীনদার বোনই পরিপূর্ণ দ্বীনদার ছেলে পান না। এমতাবস্থায় বিয়ে না করে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। দেখা যায় পারিবারিক ও সামাজিক চাপ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, বিয়ে না করে থাকা যায় না।

এমতাবস্থায় অনেক দ্বীনদার মেয়েই যেকোনো ছেলেকে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন। ফলে বাকি জীবন যথেষ্ট ভুগতে হয়। এমন ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ থাকবে :

১. এমন ছেলেকে অন্তত বিয়ে করুন, যে হালাল উপার্জন করে।

২. যে কমপক্ষে ঠিকমতো নামাজ পড়ে এবং পর্দানশীন স্ত্রীর কদর করে।

৩. যে পর্দা বলতে আসলে কী বোঝায় তা বোঝে।

৪. স্ত্রীকে সঠিকভাবে পর্দা করাতে আগ্রহী।

---

৩৮. বুখারী, হাদীস নং ৫০৯০; মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৬; নাসায়ী, হাদীস নং ৩২৩০; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০৪৭; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৮৫৮; আহমাদ, হাদীস নং ৯৫২১; ইরওয়া, হাদীস নং ১৭৮৩; সহীহ আল জামে, হাদীস নং ৩০০৩

৫. মাহরাম ও গাইরে মাহরাম মেইন্টেইনে স্ত্রীর সহায়ক হবে।

এ বিষয়গুলো বিয়ের আগেই কথা বলে পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পাত্র বলে বিয়ের পর নামাজ পড়ব, এটা আসলে কোনো উপযুক্ত কথা না। আল্লাহ তাআলার ইবাদত তো আল্লাহ তাআলার জন্যই হবে। যে অন্যের জন্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত ধরতে বা ছাড়তে পারে, সে এরপর অন্য কাউকে মনে ধরলে যে আরেক পথে পা বাড়াবে না এর কোনো নিশ্চয়তা আসলেই নেই।

এ ছাড়া লোক দেখানো আমল হচ্ছে রিয়া, যাকে হাদীসে ছোট শিরক কিংবা লুক্কায়িত শিরক বলা হয়েছে।

অন্যদিকে দেখা যায় পাত্র মাশাআল্লাহ নামাজী, মেয়েকে পর্দাও করাবে। অথচ বিয়ের পর দেখা গেল পর্দা বলতে কী বোঝায় সে তা-ই জানে না। তার পরিবারে এই ধ্যানধারণা রয়েছে যে, পর্দা মানে হলো বাসার বাইরে গেলে একটা বোরকা পরে বের হওয়া, ব্যস এটুকুই। ফলে বিয়ের পর শ্বশুরের শারীরিক খেদমত করতে বাধ্য করা হয়, মুরুব্বি আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে যুবক আত্মীয় পর্যন্ত সকল প্রকার পুরুষদের সাথে দেখা করতে ও কথা বলতে বাধ্য করা হয়।

এমনও কেইস আমরা পেয়েছি, যেখানে দেখা গেছে স্বামী বিয়ের আগে জানিয়েছে সে খুবই দ্বীনদার, তবে তার পরিবারে তার দুলাভাইয়ের অনেক প্রভাব। তাই দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে হবে, হেসে কথা বলতে হবে এবং নিকাব করা যাবে না। ব্যস, এটুকু ছাড় দিতে পারলেই বাকি ৯৭% দ্বীন পালন করা যাবে।

কিন্তু বিয়ের পর এটুকুকে উপজীব্য করে আরও বহু নাজায়েয কাজই তাকে করতে হয়েছে, এবং জানামতে এই নারী এখন আর পর্দা করেন না, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

এ জন্য বিয়ের আগে পাত্রপক্ষের সাথে কথা বলে সুনিশ্চিত হতে হবে যে তারা পর্দা দ্বারা আসলে কোন পর্দা বোঝে—ইসলামী শরয়ী পর্দা নাকি দেশীয় সামাজিক পর্দা। এরপরই পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এগুনো উচিত হবে।

মনে রাখতে হবে, অনেক আপাত দ্বীনদার পরিবার, এমনকি মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিবারেও পর্দা জিনিসটা প্রথার মতো পালিত হয়, দ্বীন হিসেবে

নয়। এ জন্য এসব বিষয় যাচাই করে নেয়া খুব জরুরি যে, পর্দার ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আসলে কেমন।

কুফু মেলানোর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে সঠিক পথনির্দেশ পায়। কারণ, সন্তানের ভালো-খারাপ হওয়ার অনেকটাই নির্ভর করে মায়ের ওপর। মা যদি দ্বীনদার-আদর্শবান হন তাহলে সন্তানও অনুরূপ হবে। সন্তানের বেশির ভাগ অভ্যাস গড়ে ওঠে মাকে দেখে। বাবা তো সারাদিন বাইরে থাকেন, মা-ই তো সব সময় সন্তানের আশেপাশে থাকেন। তাই মা যদি হয় আমলহীন, মোবাইল-ইন্টারনেটপ্রেমী, তাহলে সন্তানও তার অনুরূপ হবে। এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়ে গেছেন,

تخيَّروا لِنطَفِكم و انكِحوا الأكفاءَ و أنكِحوا إليهم

'তোমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ রাখো।'[৩৯]

বিয়েতে যদি সমতা বিধান না করা হয় তাহলে সমাজব্যবস্থা ভেঙে যাবে অনায়াসেই। ফলে দিনে দিনে বিচ্ছেদের মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। অসংখ্য সন্তান অনাথ হবে। ইসলাম বিয়েতে কুফুর বিধান রেখেছে এ জন্যই, যাতে সমাজব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إذا جاءكم من ترضَوْن دينَه وخلقَه فأنكِحوه ، إلَّا تفعلوه تكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ

'যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, এমন কেউ তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। আর যদি তোমরা তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে।'[৪০]

---

৩৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬৮; হাকীম, হাদীস নং ২৬৮৭; বাইহাকী, হাদীস নং ৪১৩০। সনদ হাসান, তালখীস ৩/১৪৬।

৪০. তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৫; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৯৬৭; বাইহাকী, হাদীস নং ১৩৮৬৩। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান।

সুতরাং আপনি যদি মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য উচিত হবে না উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনো মেয়েকে বিয়ে করা। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই আপনি তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না। ফলে বিয়ের পর কিছুদিন সংসারে সুখ থাকলেও ধীরে ধীরে মনোমালিন্য শুরু হয়ে যাবে। এদিকে আপনারও মাথায়ও সারাদিন চিন্তা থাকবে। হ্যাঁ, কোনো উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে যদি দ্বীনের বুঝের কারণে নিম্নবিত্ত পরিবারে এসেও থাকতে সন্তুষ্ট থাকে, আপনার মতো এক বেলা খেয়ে আর দু-বেলা ভুখা থেকে থাকতে রাজি থাকে, টিনের ঘরে শান্তির আবাস গড়তে ইচ্ছুক হয়, সেটা ভিন্ন কথা।

এ ক্ষেত্রে আরও কিছু কথা না বললেই নয়। মনে রাখবেন, বিয়ে কেবল দুজন মানুষের বন্ধন না, এটা দুটো ভিন্ন পরিবারকে একত্র করে থাকে। দেখা যায় দেশের একেক অঞ্চলের একেক ধরনের কাস্টম বা প্রথা রয়েছে। মনে রাখতে হবে প্রথামাত্রই নাজায়েয নয়; বরং উরফ বা প্রথাকে শরীয়ত গুরুত্ব দেয়। সামাজিক এমন বহু প্রথা রয়েছে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয।

যখন দুটো দূরবর্তী এলাকার মানুষের মাঝে বিয়ে হয়, তখন এই কমন সমস্যা চোখে পড়ে যে, উভয় পরিবার প্রথা নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এক এলাকায় এটা করণীয় তো আরেক এলাকায় ওইটা। কোনো এলাকায় মেয়ের জামাই বাসায় বেশিদিন বেড়ালে খুশি, কম বেড়ালে ক্ষুব্ধ হয়; অন্যদিকে কোনো এলাকায় মেয়ের জামাই বেশিদিন শ্বশুরবাড়ি এসে বেড়ালে ক্ষুব্ধ হয়ে, কম বেড়ালে খুশি হয়।

যখন এমন দুই এলাকার দুটি পরিবারের মাঝে বিবাহের মাধ্যমে বন্ধন সৃষ্টি হবে, দেখা যাবে পাত্রটি উভয় সংকটে পড়েছে। প্রিয় পাঠক, কেবল ধারণা-প্রসূত কথা বলছি মনে করবেন না, এ সবই বাস্তবতা।

খোদ সাহাবাদের যুগেই মক্কার মুহাজির আর মদীনার আনসারদের মাঝে বিয়ের ফলে কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক মতপার্থক্য তৈরি হয়। এমনকি শারীরিক মিলনের পদ্ধতিগত মতপার্থক্যের কারণে উভয় এলাকার স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হয়, ফলে সূরা বাকারার ২২৩ নং আয়াতটি নাযিল হয়।

এ জন্য এলাকাগত পার্থক্যটা বিবেচনায় আনা উচিত, যেন নিজস্ব প্রথা-পদ্ধতিতে মিল থাকে। এতে পারস্পরিক সংহতি নিশ্চিত হয়। এমন না যে, অন্য জেলায় বিয়ে করা নাজায়েয, অবশ্যই জায়েয। আমরা কেবল বাস্তবতার আলোকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, নিজ জেলা বা এলাকায় বিয়ের সুফল কী কী।

অন্যদিকে ছেলে ও মেয়ের পারিবারিক প্রফেশনও অনেক ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব রাখে। দেখবেন চাকরিজীবী পরিবারের ছেলের সাথে চাকরিজীবী পরিবারের মেয়ের জীবনাচারে মিল থাকে। অন্যদিকে ব্যবসায়ী পরিবারের সাথে মেলে ব্যবসায়ী পরিবারের। যেমন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী পরিবারে সাধারণত মাসের শুরুতে বেতনের টাকা আসে। তারা সারা মাস হিসেব করে চলে। আর অবশ্যই মাসের শেষে টাকায় টান পড়ে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী পরিবারে সারা মাসই টাকা আসতে থাকে, কখনো কম, কখনো বেশি। ফলে দেখা যায় ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়েটি চাকরিজীবী পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ের পর এক অন্য জীবন দেখতে বাধ্য হয়। একদম হিসেব করে চলো, প্রত্যেক খাতের আলাদা টাকা বরাদ্দ, একটু এদিক-সেদিক করার উপায় নেই, ফলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

আমরা কেবল আর্থিক ব্যয়ের দিকটা দেখালাম। এর সাথে সম্পৃক্ত আরও বহু দিক রয়েছে, যা তারা ব্যক্তি-জীবনে ফেইস করে।

আরেকটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে বহু দল-মত প্রচলিত রয়েছে। এই মতপার্থক্য নির্ভর দলভেদের কিছু প্রশংসনীয় আর কিছু নিন্দনীয়। আমরা এ-সংক্রান্ত গূঢ় আলোচনায় যেতে চাইছি না। আমরা কেবল এতটুকু বলতে চাই যে এই দলগত পার্থক্যগুলো কখনো খুব বিষাক্ত আকার ধারণ করে। এ জন্য অনেকে নিজস্ব দল-মতের মানুষকে বিয়ে করতে আগ্রহী থাকেন, আমরা এর নিন্দা করছি না; বরং একে আমরা পারিবারিক শান্তির জন্য কল্যাণরই মনে করছি। কেননা বাস্তব জীবনে আমরা দেখেছি এ সকল মতভেদকে কেন্দ্র করে একপর্যায়ে অনেক সংসার ভেঙে গিয়েছে।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, Prevention is better than cure নীতি মোতাবেক এই ঝামেলায় পড়ার চেয়ে আগে থেকেই নিজস্ব দল-মত-রুচি-পছন্দ মোতাবেক পাত্র বা পাত্রী খোঁজাই কল্যাণকর।

বলা হয় আকলমান্দ কে লিয়ে ইশারাহি কাফি হ্যায়, আমরাও সেটা মনে করে আলোচনা এখানেই ক্ষান্ত দিলাম। আশা করি কুফুর গুরুত্ব এই আলোচনায় অনেকটাই পরিষ্কার। যদি এটা ঠিকমতো বুঝে ব্যক্তি-জীবনে এই শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানো যায়, তাহলে আমরা আশাবাদী যে পাঠক ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন।

# পরিবারকে রাজি করানো

বিয়ের আগে পরিবারকে রাজি করানো যেন বিসিএস-এর ভাইভা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতোই। হয়তো আপনার বয়স এখন ২০-২২ এর ভেতর। পরিবারের চোখে আপনি এখনো ছোট্টবেলার সেই বালকটি। যার চোখেমুখে এখনো দুষ্টুমির আভা রয়ে গিয়েছে। তাই পরিবার কখনোই চাইবে না, এখনই সংসারের জোয়াল আপনার কাঁধে উঠুক। আপনি এখনো স্টুডেন্ট, পড়ালেখা আর হাতখরচের টাকাটা বাবা না দিলে এখনো আপনাকে হাপিত্যেশ করতে হয়। এখনো আপনি ছোট্ট বাচ্চার মতো রাগ করে বসে থাকেন। কেউ কেউ টুকটাক ইনকাম করলেও সেটা তার হাত পেরিয়ে বাজার অবধিও যায় না। তো এই ছেলে বিয়ে করে বউকে কী খাওয়াবে? কী পরতে দেবে? ভবিষ্যতে বাবা হলে সন্তানকে কী খাওয়াবে? অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা কী দিয়ে করাবে? বিয়ের পর আরও কত হাবিজাবি খরচ রয়েছে, এগুলো সে কীভাবে সামাল দেবে? এসব চিন্তা করেই বাবা-মায়েরা অল্প বয়সে ছেলেকে বিয়ে দিতে চান না। তাদের এসব চিন্তা মোটেই অমূলক নয়। বা এসব কথা তাওয়াক্কুলেরও খেলাফ নয়।

কিন্তু সমস্যা হলো, ছেলে-মেয়েরা এসব কারণে বাবা-মাকে ইসলামবিরোধী, শরীয়তবিরোধী বলতেও দ্বিধা করে না। অথচ বাবা-মা থেকে সন্তানের বিষয়ে আর কে ভালো জানবে?

তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, সন্তান যদি এই পরিমাণ আয়-রোজগার করে, যা দিয়ে সে তার পরিবার চালাতে পারবে, এবং ছেলের অন্যান্য প্রস্তুতিও থাকে, তাহলে বাবা-মায়ের উচিত নয় বিয়ে দিতে দেরি করা।

তবে যাদের এখনো কোনো প্রস্তুতিই নেই, তাদের উচিত আগে প্রস্তুতি নিয়ে এরপর পরিবারের কাছে নিজেকে বিবাহের উপযুক্ত হিসেবে পেশ করা।

আফসোসের কথা হলো, অনেকেই পরিবার রাজি না হলে ঈমান রক্ষার নামে পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেন। একে তো এখানে শরীয়তের কিছু বিধিনিষেধ থাকে। দ্বিতীয়ত, যেই বাবা-মা আমাকে এত বছর লালন-পালন করলেন, তাদের না জানিয়ে বিয়ে করাটা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। আর এসব সংসার ভাঙনের মুখে পড়ে খুব শীঘ্রই। তাই ফেসবুকে বিয়ে বিয়ে করে এক শ পোস্ট দেয়ার চেয়ে বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে নিজেকে পরিবারের কাছে বিয়েযোগ্য বলে পেশ করা উচিত। প্রস্তুতি নেয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে সবর করতে হবে। অনেকেই আবার তখন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। তাদের জন্য উচিত হলো গুনাহের সামগ্রী থেকে দূরে থাকা। আমি মোবাইল-ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকব আর আমার যৌনতাড়না সীমা ছাড়াবে না, এটা তো অসম্ভব। মোবাইল-ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকলে তো দশ-বারো বছরের বালকও বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগবে, তো তাকেও কি তখন বিয়েযোগ্য বলা হবে?

এ জন্য যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন না হবে ততদিন বাসায় বিয়ের কথা না বলে নিজে নিজে প্রস্তুতি নেয়াই উত্তম। এর পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি দুআ করা চাই। দেখবেন আল্লাহ তাআলাই আপনার পরিবারের লোকদের অন্তরে ঢেলে দেবেন যে, ছেলে এখন বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে, তাকে এখন বিয়ে দিতে হবে। মূলত আল্লাহ তাআলা আমার ভাগ্যে যেদিন বিয়ে নির্ধারণ করে রেখেছেন আমার বিয়ে সেদিনই হবে। কিন্তু এর আগে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। প্রস্তুতি নেয়া ছাড়া পরিবারের লোকদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো লাভ নেই। তাই বলে প্রস্তুতি নিতে নিতে বয়স পেরোনো যাবে না। এ জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআও করতে হবে। নিজের আমল বাড়াতে হবে। আমরা যা পরিকল্পনা করি আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা এর থেকে বহু গুণে উত্তম।

এ তো গেল ভাইদের কথা, বোনদেরও তো বিয়ের কথাটা বাসায় জানানো লাগে। যদি কোনো বোন আসলেই দ্বীনের স্বার্থে দ্রুত বিয়ে করতে চান, তাহলে আগে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে শুরু করুন। এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে মেয়েদের বিয়ে দ্রুতই হয়। তবে এর পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। সামনে হয়তো

এমন দিন আসবে, যখন বাবা-মা মেয়েদেরও দ্রুত বিয়ে না দিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করতে বলবে।

আমরা ইতিমধ্যেই এমন কেইস দেখেছি, যেখানে মেয়ের অভিভাবক মেয়েকে মোটেও বিয়ে দিতে আগ্রহী নন। তারা চান মেয়ে যেন ক্যারিয়ার গঠন করে তাদের কামাই করে খাওয়ায়!

যদি ছাত্রাবস্থায়ই এরকম লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে মেয়েদের উচিত হবে পরিবারের মুরুব্বি কোনো মাহরাম আত্মীয়ের মাধ্যমে বিয়ের কথাটা বাসায় তোলা, তাদের বোঝানোর উদ্যোগ নেয়া। এটা অনেক ক্ষেত্রে কাজে দেয়। এ ছাড়া মা-কে বললেও কাজ হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যখন তারা বিয়ে দিতে আসলেই রাজি হয়ে যাবে তখন কৌশলে নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা তাদের জানাতে ও বোঝাতে হবে, যেন তারা বোঝেন যে আপনার আসলে কোন ধরনের পাত্র দরকার।

বাবা-মা অনেক ক্ষেত্রেই আপনার পছন্দের সাথে, আপনার বিবেচনার সাথে একমত নাও হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, তাদের অভিজ্ঞতা বেশি, এবং তারা আপনার কল্যাণ চান। তখন তাদের মতামতকে ভেবে দেখবেন যে সেটা দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; যদি হয় তাহলে অমত না করে মেনে নিন, ইনশাআল্লাহ বারাকাহ পাবেন, তাদের দুআও সাথে থাকবে।

আর যদি দেখা যায় দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং সাংঘর্ষিক, সে ক্ষেত্রে আদবের সাথে দ্বিমত করে নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করুন।

সর্বাবস্থায় মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা যদি আপনার কল্যাণ চান তাহলে কেউই আটকাতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি দুআ করুন, তাঁর কাছে সাহায্য চান, প্রতিদিন দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে চাইতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ তাকদিরে উদ্দিষ্ট সময়েই আপনি উত্তম জীবনসঙ্গী পেয়ে যাবেন।

যদি দেখা যায়, পড়াশোনা শেষ এখন চাকরি করা ছাড়া গতি নেই, এমন সময়ও আপনার অভিভাবক বিয়ে দিতে মোটেও আগ্রহী নয়; এমতাবস্থায় এমন বোনের জন্য উচিত হলো কোনো প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেমের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নেয়া।

# শরীয়তসম্মত বিয়ে ও সংসারের প্রস্তুতি

আপনার আর্থিক প্রস্তুতি, মানসিক প্রস্তুতিও সারলেন। বেশ ভালো। এখন বিয়ের পালা। কিন্তু পরিবার-বংশের সবাই চাচ্ছে, আপনি পরিবারের একমাত্র সন্তান তাই আপনার বিয়েটা হবে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। আপনি মানা করতেও পারছেন না, কারণ আপনার কথা বাসার কেউ পাত্তা দেবে না। অথবা আপনি নিজেও হয়তো বিষয়টি উপভোগ করছেন। কিন্তু এই বিষয়টিই আপনার বিয়ে-পরবর্তী জীবনে সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, যে বিয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে না হবে, সে সংসারে সুখ-শান্তি ধরা দেয় খুব কম। কারণ, যে কাজ শুরুই হয়েছে বিভিন্ন হারাম কাজ দিয়ে, সেখানে আল্লাহ-প্রদত্ত সুখ আসবে কী করে!

এ জন্য বিয়ের আগে অন্যতম একটি প্রস্তুতি হলো, নিজেকে এবং কমপক্ষে নিজের পরিবারকে দ্বীনের ওপর উঠানো। যতটুকু দ্বীন মানার দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো মানতে পারবেন এবং হারাম কাজগুলো বর্জন করতে পারবেন, এখানে ততটুকুই উদ্দেশ্য।

অনেক দ্বীনদার ব্যক্তির বিয়ের সময়ও দেখা যায় তারা সুন্নাহ অনুসারে বিয়ের পরিবর্তে সমাজের প্রচলিত নিয়মে বিয়ে করছেন, যাতে সুন্নাতের কোনো নামগন্ধই থাকে না। শুধু ইজাব-কবুলের যে নিয়মটি শরয়ীভাবে হয়, সেটাও হয় পুরুষ-মহিলা সবাই একসাথে বসে। এ জন্যই বলা হয়, মানুষের দ্বীনদারী প্রকাশ পায় তার বিয়ে আর লেনদেনের সময়। এমনকি বিয়েতে কী কী কাজ সুন্নাত আর কী কী কাজ শরীয়ত-বহির্ভূত এটাও অনেকে জানেন না। আবার অনেকে জানলেও স্পষ্ট হারাম কাজে জড়িয়ে পড়েন সমাজের দোহাই দিয়ে। দুনিয়াতে

সমাজের ভয়ে আমি যদি এসব হারাম ও গর্হিত কাজগুলো করতে পারি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন মুখে দাঁড়াব?

আরও ভয়ংকর কথা হলো, অনেকেই এসব সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে ব্যাংক থেকে চড়া সুদে বিশাল অঙ্কের টাকা লোন নিয়ে বসেন। মাওলানা তারিক জামীল সাহেব এক বয়ানে শোনাচ্ছিলেন, করাচির এক ব্যক্তি চল্লিশ লাখ টাকা খরচ করে তার ছেলেকে বিয়ে করায়; পরে শোনা যায় পুরো টাকাটাই তিনি ব্যাংক থেকে চড়া সুদে লোন নিয়েছেন! আচ্ছা এখানে তার কয়টি গুনাহ হলো বলতে পারবেন? সুদ, শরীয়ত-বর্জিত রুসম-রেওয়াজ পালন, অপচয়, বেপর্দা এমন অসংখ্য গুনাহের বোঝা এখন তার কাঁধে উঠে গিয়েছে। মানুষ কিয়ামতের দিন একটি গুনাহের ভারের কারণেই জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে, আর এখানে অসংখ্য গুনাহকে যেন কোনো গুনাহই মনে করা হচ্ছে না। আরও আশ্চর্য হওয়ার কথা হলো, খোঁজ নিলে দেখা যাবে এসব বিয়ে কোনো কাফের-মুশরিকের বিয়ে নয়; বরং দ্বীনের লেবাস লাগানো আমাদের মতো ব্যক্তিরই বিয়ে! তারাও কিন্তু নামাজ পড়েন, তারাও আল্লাহ তাআলাকে রব হিসেবে স্বীকার করেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত কাজ হারাম করেছেন তারা সেগুলো সামাজিকতার ভয়ে ছাড়তে রাজি নয়। অনেকেই বলে, আরে হুজুর, একদিনের জন্যই তো! সারাজীবন তো আর বিয়ে করব না। এখন একটু খরচ করলে কীই-বা হবে! পরে না-হয় তওবা করে নিলাম। এসব কথা মূলত দ্বীন নিয়ে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ জন্য বিয়ের আগে নিজে প্রতিজ্ঞা করা চাই, আমি সুন্নাহ অনুসারে বিয়ে করব। আমার বিয়েতে কোনো ধরনের হারাম কার্যকলাপ, অশ্লীলতা, অপচয় এসব থাকবে না। সমাজ যা বলে বলুক। আমার দ্বীন আগে, সমাজ নয়।

এরপর নিজের পরিবারের ভেতর দ্বীনের এতটুকু বুঝ আনতে হবে, যেন তারা বিয়েতে এসব শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ না করেন।

এ জন্য উত্তম হলো বিয়ের আগেই উভয় পরিবার একসাথে বসে সব কথা চূড়ান্ত করে নেয়া, কোনো পক্ষই শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করবে না।

এ সংশ্লিষ্ট আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিয়ে-পরবর্তী জীবনযাপন।

অনেকেই দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করে আনেন, কিন্তু নিজের ঘরে দ্বীনী পরিবেশ না থাকার কারণে মেয়েটি অস্বস্তিতে ভোগেন। এমনকি কখনো কখনো পরিবেশ না থাকার কারণে তার বিভিন্ন আমলও ছুটে যায়। যে ঘরে আমলী পরিবেশ থাকে সেই ঘরে দুনিয়াবি ঝুট-ঝামেলা কম থাকে। সেখানে ঝগড়াঝাঁটি কম হয়। আর যে ঘর আমল থেকে খালি থাকে সেখানে শয়তান এসে বাসা বাঁধে। ফলে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য, ঝগড়া সৃষ্টি হয়।

এমনও অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, মেয়ের পরিবার দ্বীনদার, বিয়ের আগে মেয়ে ভালোই আমল করত, কিন্তু এখন শ্বশুরবাড়ি এসে ঠিকমতো নামাজ পড়ারও সময় পায় না। মেয়েদের জন্য নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরেই নামাজ পড়ে নেয়া সুন্নাত। কিন্তু বাসার বিভিন্ন কাজের চাপে কখনো কখনো এই নামাজ পড়তে হয় সময় ফুরিয়ে যাবার বেলায়। মাঝে মাঝে আগে নামাজ পড়ার জন্য ওযু করতে গেলেও শাশুড়ি বকাঝকা করেন। কাজের গুরুত্ব নেই, অলস বউ। বাপের বাড়ি কি কাজ করোনি? এসব কথাও শুনতে হয়।

এ জন্য বিয়ের আগে নিজের ঘরে আমলী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যাতে দ্বীনদার মেয়ে এসে দুনিয়ার পাল্লায় পড়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে না যায়।

এ সংশ্লিষ্ট আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পর্দার বিধান। অনেক ছেলে নিজে পর্দার বিধান মেনে চললেও নিজের ঘরে পর্দার কোনো বালাই থাকে না। ঘরের অন্য সদস্যরা পর্দার বিধান মেনে চলে না। ফলে দ্বীনদার কোনো মেয়ে যদি এই ঘরে আসে তখন তার কী পরিমাণ কষ্ট হবে বলাই বাহুল্য। অনেক মেয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে দীর্ঘদিন এসব ব্যাপার মুখ বুজে সয়ে এরপর বিচ্ছেদের পথে পা বাড়ান। কারণ, তার কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে দ্বীনের প্রতিটি হুকুম অগ্রগণ্য। আর স্বামী বেচারাও কিছু করতে পারেন না। কারণ, তার ঘরে এতদিন দ্বীনী পরিবেশ ছিল না, এতদিন সবাই পর্দা করত না, এখন হঠাৎ করে তাদের আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। তাই উচিত ছিল এ ব্যাপারে আগে থেকেই পদক্ষেপ নেয়া।

আর বিয়ের পর স্ত্রীকে পর্দার সাথে রাখা তো স্বামীর জন্য ফরজও বটে। স্বামীর পরিবার যদি যৌথ পরিবার হয় তাহলে স্ত্রীকে আলাদা ঘরে রাখা উচিত। যৌথ পরিবার বলতে বুঝিয়েছি যে পরিবারে একাধিক ভাই তাদের স্ত্রী-সন্তানসহ একত্রে বসবাস করেন। এসব পরিবারে চাইলেও পর্দার বিধান ঠিকঠাকমতো পালন করা যায় না। দেবরের সাথে ভাবির পর্দা, ভাতিজার সাথে চাচির পর্দার বিধান যেন

আজ সমাজ থেকে উঠেই গিয়েছে। দেবরকে মনে করা হয় ছোটভাইয়ের মতো; অনেক পরিবারে আবার দেবরকে ছোট স্বামী বলেও ডাকা হয়! এটা সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফের ভেতর দেবরের বিষয়ে কঠোর শব্দ এসেছে,

إِيَّاكُمْ والدُّخُولَ عَلَى النِّساءِ، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ: يا رَسولَ اللهِ، أفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قالَ: الحَمْوُ المَوْتُ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বেগানা নারীদের কাছে যাওয়া থেকে দূরে থাকো। এক আনসার সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দেবরের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।'[৪১]

الحَمْوُ। শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই। চাই সে স্বামীর ছোট অর্থাৎ দেবর হোক বা স্বামীর বড় অর্থাৎ ভাসুর হোক। এই হাদীসের মধ্যে স্বামীর চাচাতো-ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ইত্যাদি ভাইয়েরাও অন্তর্ভুক্ত।

দেবর বা ভাসুরকে মৃত্যুতুল্য বলার কারণ হলো, সমাজে দেবর বা ভাসুরের সাথে পর্দার বিষয়ে অনেক কমতি রয়েছে। অথচ স্বামীর অগোচরে এ দুইজনের একাকী সময় কাটানোর ফলে অনেক সংসার ভেঙে গেছে এর নজির খুঁজতে তেমন কষ্ট হবে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়ে গেছেন, 'তোমরা মৃত্যুকে যেভাবে ভয় করো, দেবর বা ভাসুরকেও সেভাবে ভয় করো। কেউ কেউ শুধু মাথায় কাপড় দেয়াকে পর্দা মনে করেন। এবং এভাবে তারা ঘরে দেবর বা ভাসুরের সামনে বসেও খাবার খান। ঘরে চলাফেরা করেন। এ সবকিছুই শরীয়তের পর্দার বিধান অমান্য করার শামিল। তাই অবশ্যই বিয়ের আগে এটুকু প্রস্তুতি আপনাকে নিতে হবে, যাতে আপনার স্ত্রীকে আপনি পর্দার শরয়ী সীমার মধ্যে রাখতে পারেন। যদি যৌথ পরিবারেই রাখতে হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য অবশ্যই আলাদা ঘর ও আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে স্ত্রীকে নিয়ে ভিন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই ভালো। তবে এসবের পূর্বে নিজের

৪১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭২

পরিবারের লোকদের ভেতর দ্বীনের বুঝ আনতে হবে। কারণ, স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থাকতে গেলে অনেক পরিবারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

তাদের পর্দার বিধান বোঝাতে হবে। পর্দা না মানার ভয়াবহতা বোঝাতে হবে। আর এটা দুয়েকদিনের ব্যাপার না। তাদের এতদিনের অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে দীর্ঘদিন মেহনত করতে হবে। তবে এর জন্য আরও একটি জরুরি বিষয় রয়েছে, তা হলো, আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। নিজে পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

অনেক যুবককে দেখা যায়, তারা পরিবারের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন—তাদের বারবার বোঝানো সত্ত্বেও তারা দ্বীনের হুকুম-আহকাম মেনে চলছেন না। পর্দার বিধান মেনে চলছেন না। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ওই যুবক নিজেই শরীয়তের হুকুম-আহকামগুলো মেনে চলছে না। নিজেই চাচাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, ফুফাতো বোনের সাথে দেখা করে। নিজেই এখনো মাঝে মাঝে বাসায় টিভি দেখে। ফলে বাসায় তার দাওয়াতের তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না। কারও ভেতর দ্বীনের বুঝ আনতে হলে আগে নিজে দ্বীনের ওপর উঠতে হবে। এটা তা পরীক্ষিত বিষয়, মানুষ যেই কাজ নিজে করে সেই কাজের দাওয়াত দিলে এর প্রভাব বেশি পড়ে। তাই পরিবারের ভেতর দ্বীন আনতে হলে আগে নিজের ভেতর দ্বীন আনতে হবে। পরিবারকে দ্বীনের পথে আনতে হলে আগে নিজে দ্বীনের পথে চলতে হবে। অন্যথায় বাসায় পর্দার কথা বললে উল্টো হাসির পাত্র হতে হবে। নিজে নামাজ না পড়ে যদি বাসার কাউকে নামাজের দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে উল্টো সবাই হাসাহাসি করবে।

শুরুতে যদিও আমরা ঈমান-আমলে প্রস্তুতির ব্যাপারে আলোচনা পড়েছি, তবুও এখানে আবার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন হয়। ঈমান-আমলে প্রস্তুতি নেয়ার আগে বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়। এতে নিজের যেমন ক্ষতি হয়, আমার ঘরে যে মেয়েটি আসবে তারও দ্বীনের ক্ষতি হবে। আর এ প্রস্তুতিটা যেন পোশাকি প্রস্তুতি না হয়; বাস্তবিক প্রস্তুতি হয়। কারণ, অনেক মেয়ে বা মেয়ের পরিবার বিয়ের সময় ছেলের পোশাক, কথাবার্তা দেখে দ্বীনদার মনে করে বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পর যখন তার আসল রূপ প্রকাশ পায় তখন পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। কিন্তু তখন তো আর পিছুটানের কোনো সুযোগ নেই।

বিয়ে আর তালাক—এ দুয়ের কোনো পিছুটান নেই। আবার নতুন করে শুরু করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে পিছুটান মানেই আর্তনাদমাখা কিছু উপাখ্যান। কিছু অবুঝ শিশুর করুণ চাহনি। যে উপাখ্যান শুনতে আমরা কেউই প্রস্তুত নই। যে চাহনির তীব্রতার দিকে তাকিয়ে থাকার শক্তি আমাদের নেই।

এমন ঘটনাও শোনা যায়, বিয়ের আগে ছেলেকে দ্বীনদার ভেবে বিয়ে দেয়ার কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে বারবার মেয়েকে যৌতুকের জন্য চাপাচাপি করা হয়। কাউকে আবার রমজানে মেয়ের বাড়ি থেকে জোরপূর্বক ইফতারি পাঠানোর মতো ঘৃণ্য প্রথার জন্য চাপাচাপি করা হয়।

তাই বিয়ের আগেই শরীয়তসম্মত বিয়ে এবং সংসার পরিচালনার প্রস্তুতি নিতে হবে।

এ সমস্যার ভুক্তভোগী শুধু ছেলেরা তা নয়; অনেক মেয়েরাও এ দোষে দুষ্ট। ফলে বিয়ের পর তারা শ্বশুরবাড়ির অনেক কিছুই মেনে নিতে পারে না। এই যেমন, কারও অভ্যাস ছিল বাবার বাড়িতে সে দেরি করে ঘুম থেকে উঠত, ফজরের নামাজের কোনো খবর ছিল না। এই বাজে অভ্যাস পরিবর্তন না করার কারণে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এসে ফজরের আগে তার ঘুম থেকে উঠতে অনেক কষ্ট হয়। আগে হয়তো দুয়েকবেলা নামাজ পড়া হতো, কিন্তু এখানে এসে আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়া তার জন্য পাহাড়সম হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য এসব বাজে অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করে বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া চাই। আমার ঘর, আমার পরিবার যদি আমি আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে চালাতে না পারি, তাহলে আমি এখনো সংসার পরিচালনার যোগ্য হইনি। এখনো আমার ভেতরে সাংসারিক ভাব আসেনি। আর এর কুফল যে শুধু স্বামী-স্ত্রীই ভোগ করবে তা নয়, পরবর্তী প্রজন্ম এর কারণে হারিয়ে ফেলবে সত্য পথের দিশা। তারাই এর বেশি ভুক্তভোগী হবে।

# প্রয়োজনীয় মাসায়েল জেনে নেয়া

বিয়ের আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো বিয়ে ও বিয়ে-পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে মাসাআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া। কিন্তু এ বিষয়ে কয়জনই-বা প্রস্তুতি নিই আমরা? বিয়ের আগের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, কীভাবে সুন্নাত তরিকায় বিয়ে করা যাবে, বিয়েতে কী কী কাজ শরীয়ত সমর্থন করে না ইত্যাদি বিষয় তো জানতেই হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'[৪২]

এই হাদীসে আলেম বা মুফতী হওয়াকে ফরজ বলা হয়নি। শরীয়তের বিধান হলো, প্রত্যেক অঞ্চলে কমপক্ষে একজন আলেম থাকা ফরজে কেফায়া, যাতে তিনি ওই অঞ্চলের মানুষদের শরয়ী সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। তবে মানুষ যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হয় সে অবস্থার ইলম অর্জন করা তার জন্য ফরজ। যেমন কেউ ব্যবসা শুরু করবে, তার জন্য ফরজ হলো ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় মাসায়েল জেনে নেয়া। কীভাবে ব্যবসা করলে ব্যবসা সুন্নাহ অনুসারে হবে আর কীভাবে করলে ব্যবসার আয় হারাম হয়ে যাবে—এগুলো জেনে নেয়া।

অথবা কেউ সফরে বের হবে, সফর-সংক্রান্ত যাবতীয় মাসায়েল জানা তার জন্য ফরজ। কখন সে নামাজ কসর পড়বে বা কখন পূর্ণ পড়বে, সফর অবস্থায় কী কী বিধান রয়েছে এ সমস্ত ইলম অর্জন করা তার জন্য ফরজ।

---

৪২ সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪; বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, ১৫৪৩; মুসনাদে আবু ইয়া'লা, ৪০৩৫; তাবারানী, মুজামুল আওসাত, ১/৭ হাদীস নং ৯। হাদীসটির সমস্ত সনদ পর্যালোচনা করে শাইখ শুআইব আল আরনাউত হাদীসটিকে হাসান লি শাওয়াহিদ বলেছেন। حديث حسن بطرقه وشواهده

কেউ রাষ্ট্রপ্রধান হলো, তার জন্য আবশ্যক হলো রাষ্ট্র পরিচালনার শরয়ী বিধান জেনে নেয়া।

এমনইভাবে কেউ বিয়ে করতে চাইলে বিয়ের পূর্বেই তাকে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া আবশ্যক।

মোদ্দাকথা, মানুষ যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হয় সে অবস্থার শরয়ী বিধানাবলি জানা তার জন্য আবশ্যক। উপর্যুক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই বুঝিয়েছেন।

এ জন্য উচিত হলো বিয়ের আগে অভিজ্ঞ কোনো মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া। এর মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে তালাক-সংক্রান্ত মাসায়েল। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এখনো বিয়েই করলাম না, তালাকের মাসআলা জেনে কী করব! আর আমি কি আমার প্রিয়তমাকে কখনো তালাক দেব না কি!

অথচ ঈমান-বিষয়ক আলোচনার পর মানুষ সবচেয়ে গাফেল সম্ভবত তালাক-সংক্রান্ত বিষয়ে। যারা এ-সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল পড়েছেন তারা ব্যতীত সাধারণ লোকদের ৯০%-এরও বেশি মানুষ তালাকের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

কী কী কথার কারণে তালাক হয়ে যাবে মানুষ এটাই জানে না। ফলে তালাক হয়ে যাওয়ার পরও বহু বছর যাবৎ তারা সংসার করতেছে। সন্তানাদিও হচ্ছে। ফলে এসব সন্তান শরয়ী বিধান অনুযায়ী পিতৃপরিচয়হীন হয়ে বড় হচ্ছে। এ অবস্থায় যতদিন স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে ততদিন তাদের যিনার গুনাহ হতে থাকবে।

কোনো স্বামীই চায় না তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে তার বিচ্ছেদ হয়ে যাক। কিন্তু ঝগড়া তো প্রত্যেক পরিবারের দৈনন্দিন বিষয়। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু তখনই শয়তান দুজনের মাঝে খুব বড় একটি কাজ করে বসে, তা হলো, স্বামীর মুখ থেকে সে এমন কথা বের করে বসে যার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায়! অথচ স্বামী ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। কেউ কেউ তো স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে মাসআলা না-জানার কারণে পুনরায় বিয়ে করে সংসার করতে থাকে!

এ জন্য উচিত হলো, বিয়ের আগেই অভিজ্ঞ কোনো মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে বিয়েশাদি-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জেনে নেয়া। প্রয়োজনীয় কিতাবাদি সংগ্রহ করা। মূলত বেশির ভাগ লোকই তালাক স্বেচ্ছায় দেয় না, অনিচ্ছায় তালাক-সংক্রান্ত শব্দ বলে ফেলার কারণেই তালাক হয়ে যায়।

আর উটের যেমন সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে আসা-যাওয়া করা অসম্ভব, একবার তালাক হয়ে যাওয়ার পর সেই কথা আবার ফিরিয়ে নেয়াও অসম্ভব।

বেশির ভাগ লোক মনে করেন, তালাক যদি রাগের মাথায় দেয়া হয় তাহলে তালাক হয় না। এটা বুঝে তারা দিব্যি সংসার করতে থাকেন। অথচ এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, তালাক তো কেউ হাসিখুশি অবস্থায় দেয় না। কখনো তো এমন হবে না যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে হাসতে হাসতে বলতেছে, ওগো, আমি আজকে তোমার ওপর অনেক খুশি, এই খুশিতে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম! বরং তালাক তো দেয়াই হয় ঝগড়া অবস্থায় রাগের মাথায়। বিয়ে, তালাক আর গোলাম আযাদ—এই তিনটি বিষয় মুখ থেকে বের হয়ে গেলেই আর কখনো ফিরিয়ে নেয়া যায় না।[৪৩] কেউ যদি বিয়ের সব শর্তসহ অভিনয় বা ঠাট্টা করতে করতে ইজাব-কবুল করে ফেলে, তাহলে তার বিয়ে হয়ে যাবে। এমনইভাবে কেউ যদি স্ত্রীকে তালাকের কোনো শব্দ বলে ফেলে, চাই সেটা রাগের মাথায় হোক বা ঠান্ডা মাথায়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তালাক হয়ে যাবে।

৪৩. আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৯৪; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৮৪; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২০৩৯। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান।

# তালাক-সংক্রান্ত জরুরি আলোচনা

অতি প্রয়োজন (যা শরীয়তে ওজর বলে গণ্য) ছাড়া স্বামীর জন্য যেমন তালাক দেয়া জায়েয নয়, তেমনি স্ত্রীর জন্যও তালাক চাওয়া দুরস্ত নয়। তালাকের পথ খোলা রাখা হয়েছে শুধু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। বর্তমান সমাজে, বিশেষ করে আমাদের এতদঞ্চলে কোনো পরিবারে তালাকের ঘটনা যে কত ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা, জুলুম-অত্যাচার এবং ঝগড়া-বিবাদের কারণ হয় তা আর বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। তালাক প্রদানের ক্ষমতাকে শরীয়তের নির্ধারিত নীতিমালার বাইরে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধানের সাথে বালখিল্যতার শামিল।

এ জন্য কেউ দাম্পত্য-জীবনে পা রাখার চেষ্টা করলে তার অপরিহার্য কর্তব্য হবে, বিয়ের আগেই দাম্পত্য-জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলোর সাথে তালাকের বিধানসমূহ জেনে নেয়া।

তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা ভুল পন্থায় তা প্রয়োগ করলে সে একদিকে যেমন গুনাহগার হবে, অন্যদিকে তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি বিবেচক স্বামীর দায়িত্ব হলো, তালাকের শব্দ কিংবা এর সমার্থক কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করা থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

অবশ্য অতীব প্রয়োজনে তালাক প্রদানে বাধ্য হলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শুধু এক তালাক দিয়ে ক্ষান্ত হওয়া উচিত। এভাবে বলবে, 'তোমাকে তালাক দিলাম।' তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ কিংবা ৩ সংখ্যা ব্যবহার করবে না। কেউ 'বায়েন' শব্দ বলে ফেললে (চাই তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে

শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে—একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেয়া হোক—যেমন বলল, তোমাকে তিন তালাক দিলাম। অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল। সর্বমোট তিন তালাক দেয়া হলো। যেকোনো উপায়ে তিন তালাক দেয়া হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধু মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বিবাহে ফিরিয়ে আনার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না, তেমনি নতুন করে বিবাহ দোহরানোর মাধ্যমেও ফিরিয়ে নেয়ার পথ খোলা থাকে না।

একসাথে তিন তালাক দেয়া কিংবা বিভিন্ন সময় তালাক দিতে দিতে তিন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া একটি জঘন্য অপরাধ ও ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাআলা এর শাস্তি হিসেবে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসাথে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হওয়া এবং সে স্বামীর সাথে তার মিলন হওয়া অপরিহার্য। এরপর কোনো কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর এরা দুজন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এ জন্য শরীয়ত আগেই সাবধান করে দিয়েছে যে, প্রথমত তালাকের কথা চিন্তাও করবে না। তবে অতি প্রয়োজনে কখনো তালাক প্রদানের প্রয়োজন হলে শুধু সাদামাটা তালাক দাও, শুধু এক তালাক। যেন উভয়ের জন্যই নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে এবং পুনরায় ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। এরপর আবারও কোনো সমস্যা দেখা দিলে এভাবেই শুধু এক তালাক দেবে। এখনো ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এরপর যদি আবার কখনো শুধু এক তালাকই দেয়া হয় এবং সব মিলে তিন তালাক হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় আর তাকে ফিরিয়ে আনারও সুযোগ থাকবে না, নতুন করে বিয়ে করার বৈধতাও বাকি থাকবে না।

আজকাল স্বামী-স্ত্রী তালাকের বিধান জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার পরিবর্তে নিজেদের মনে এমন-সব ভুল ও বানোয়াট মাসআলা স্থির করে রাখে যে, আল্লাহ

মাফ করুন। আমরা এমন কয়েকটি ভুল ধারণা উল্লেখ করছি :

১. তিন তালাক ছাড়া কি তালাক হয় না?

যেমন কেউ মনে করে যে, শুধু এক বা দুই তালাক দেয়ার দ্বারা তো তালাকই হয় না। তালাকের জন্য একসাথে তিন তালাক দেয়াকে তারা অপরিহার্য মনে করে।

মনে রাখবেন, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তালাক দেয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো, শুধু এক তালাক দেয়া। পরবর্তী সময়ে আবারও প্রয়োজন হলে শুধু এক তালাকই দেবে। এরচেয়ে বেশি দেবে না। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্ক বহাল রাখার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

একই মজলিসে কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেয়া হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ এমনটি করলে তালাক কার্যকর হবে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে।

২. তালাকের সাথে কি বায়েন শব্দ ব্যবহার করা জরুরি?

অনেকে মনে করে, শুধু তালাক বললে তালাক হয় না; বরং তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দও যোগ করা অত্যাবশ্যক।

এটিও ভুল ধারণা। শুধু তালাক শব্দ দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। এর সাথে 'বায়েন' শব্দ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এ শব্দের সংযোজন নাজায়েয। তবে কেউ যদি এক তালাক বায়েন বা দুই তালাক বায়েন দেয়, তবে সে মৌখিকভাবে রুজু করার (পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার) পথ বন্ধ করে দিল। এখন শুধু একটি পথই খোলা আছে। আর তা হলো, নতুনভাবে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো। অথচ শুধু তালাক বললে এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত মৌখিক রুজুর পথ খোলা থাকে। এ জন্য স্বামীর উচিত, যত উত্তেজিতই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই যেন তিন তালাক না দেয়। এমনকি তা কখনো মুখেও না আনে। অথচ অনেকে তো তিন তালাক দেয়ার পরও পৃথকভাবে 'বায়েন' শব্দ যোগ করেন। যেন সবক'টি তালাক দেয়ার পরও তার মন ভরল না। নাহলে তিন তালাক দেয়ার পর আর কী বাকি থাকে যে, 'বায়েন' শব্দ বলতে হবে!

মনে রাখবেন, তিন তালাক দেয়াই এক গুনাহ, এরপর 'বায়েন' শব্দ যোগ করে সে আরও বেশি গুনাহগার হলো।

৩. একসাথে তিন তালাক দিলে কি তালাক হয় না?

অনেকে এই ভুল ধারণাও প্রচার করে রেখেছে যে, একসাথে তিন তালাক দেয়া হলে তালাক হয় না কিংবা শুধু এক তালাক হয়।

এটিও একটি মারাত্মক ভুল। একসাথে তিন তালাক দেয়া জায়েয না হলেও কেউ যদি এই নাজায়েয কাজ করে, তাহলে তার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক ঠিকই পতিত হয়। এ ক্ষেত্রে তার মৌখিকভাবে রুজু করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি নতুন করে বিবাহ দোহরিয়ে নেয়ার দ্বারাও তারা একে অপরের জন্য হালাল হতে পারে না। তাই সকল স্বামীরই কর্তব্য, প্রথম থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা। মুখ দিয়ে কখনো 'তিন তালাক' কিংবা 'তালাক, তালাক, তালাক' শব্দ উচ্চারণ না করা। আর আগেই দুই তালাক দিয়ে থাকলে এখন আর তৃতীয় তালাকের চিন্তাও না করা।

৪. গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক পতিত হয় না?

অনেকে এই মাসআলা বানিয়ে রেখেছে যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে তা কার্যকর হয় না। এটিও সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। গর্ভাবস্থায় হোক বা অন্য যেকোনো অবস্থাই হোক, তালাক দেয়া হলে তা পতিত হয়ে যায়। এ জন্য সঠিক মাসআলা শেখা সকলের দায়িত্ব। অজ্ঞতার ধোঁকায় থাকার কারণে হারাম কখনো হালাল হতে পারে না।

৫. তালাক পতিত হওয়ার জন্য কি সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরি?

অনেকের ধারণা, স্বামী তালাকের সময় কোনো সাক্ষী না রাখলে তালাক পতিত হয় না। আগেরটার মতো এটাও মানুষের মনগড়া মাসআলা। কোন মূর্খ এই কথা বলেছে জানা নেই। সাক্ষীর প্রয়োজন তো হয় বিবাহের সময়। তালাক পতিত হওয়ার জন্য এক বা একাধিক কোনো সাক্ষীরই প্রয়োজন নেই। স্বামী যদি রাতের অন্ধকারে একা একা বসে তালাক দেয়, তাহলেও তালাক হয়ে যায়।

৬. রাগের অবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক হয় না?

তালাক তো দেয়াই হয় রাগ হয়ে। কয়জন আছে, শান্তভাবে তালাক দেয়? আসলে তো এমনই হওয়া উচিত ছিল যে, যদি বাস্তবসম্মত ও অনিবার্য প্রয়োজনে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তাহলে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে একে

অন্যের কল্যাণকামী হয়ে বুঝে-শুনে, সঠিক মাসআলা জেনে নিয়ে মাসআলা অনুযায়ী তালাক প্রদানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ মাসআলা জানার চেষ্টাও করে না; আর না তাদের মধ্যে এই সুবুদ্ধি আছে যে, বড়দের সাথে পরামর্শ করবে, চিন্তা-ভাবনা করবে। নিজের ইচ্ছাবিরোধী কোনো কিছু পেলেই রাগের বশে তালাক দিয়ে ফেলে। আর তা এক বা দুইটি নয়, এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক।

যখন রাগ প্রশমিত হয় তখন অনুতপ্ত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বানাতে থাকে। বলে, আমি রাগের মাথায় বলে ফেলেছি, তালাক দেয়ার ইচ্ছা ছিল না। এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে, তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কোনো ইবাদত নয় যে, এর জন্য নিয়ত করতে হবে। নিয়ত থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় তালাক শব্দ বলে ফেললে বা কাগজে লিখে দিলেই তালাক হয়ে যায়। তেমনিভাবে রাগের অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়, এমনকি হাস্যরস বা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলেও তা পতিত হয়ে যায়।

অবশ্য কেউ যদি প্রচণ্ড রেগে যায় ও রাগের ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আর এ অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে, তাহলে ওই অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না। কিন্তু এ অবস্থার বাস্তবিক রূপ অসম্ভব-প্রায়।

শেষকথা এই যে, দাম্পত্য-জীবন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নিয়ামত। স্বামী-স্ত্রী সকলের কর্তব্য, এই নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং একে অপরের সকল অধিকার আদায় করা। স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, কথায় কথায় স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া। আবার স্বামীর জন্যও জায়েয নয় আল্লাহ তাআলার দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা।

বিয়ে, তালাক ও দাম্পত্য-জীবনের সকল বিধান ও মাসআলা শিক্ষা করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য জরুরি। বিশেষ করে স্বামীর কর্তব্য হলো, তালাকের মাসআলা ও এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত না হয়ে মুখে কখনো তালাক শব্দ উচ্চারণ না করা। আর যদি কোনো কারণে তালাক দেয় এবং এমনভাবে দেয় যে, এখন আর তাদের একসাথে থাকা শরীয়তে বৈধ নয়, তখন তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। বিভিন্ন টাল-বাহানা, অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে কিংবা ভুল কথার ওপর ভিত্তি করে অথবা মূল ঘটনা গোপন রেখে একসাথে বাস না করা উচিত। বিয়ে শুধু একটি সময়ের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়।

বাস্তবেই যদি তালাক হয়ে যায় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, এরপরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসাথে বাস করে, তাহলে তা হবে কবীরা গুনাহ এবং উভয়েই যেন ব্যভিচারের গুনাহে লিপ্ত।

আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা দান করুন। আমীন।[৪৪]

কখনো কখনো স্ত্রীর পক্ষ থেকেও বিচ্ছেদ চাওয়া হয়, যেটাকে আমরা ডিভোর্স বলি। আমাদের সমাজে এখন স্বামী তালাক দেয়ার চেয়ে স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পাঠানোর পরিমাণ যেন বেশি হয়ে গিয়েছে। কারণে-অকারণে, নিজের মতের সাথে না মেলার কারণে ডিভোর্স দেয়া হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর বাণী রয়েছে,

أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ

'যে মহিলা তার স্বামীর কাছে (শরয়ী) কোনো কারণ ছাড়াই তালাক চাইবে, তার ওপর জান্নাতের ঘ্রাণও হারাম হয়ে যাবে।'[৪৫]

ডিভোর্স-এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কোনো অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া সবচেয়ে ভালো।

বিয়ে-বিষয়ক আরও যেসব মাসআলা জানা অত্যাবশ্যক তা হচ্ছে, শারীরিক মিলন-সম্পর্কিত মাসআলা। আমাদের দেশের মানুষের মাঝে একটা প্রবণতা রয়েছে যে, তারা মনে করে বিয়ে করলেই হলো, বন্ধুদের থেকে জেনে নেবে বা শিখে নেবে কীভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতে হয়! অথচ দেখা গেল যা শিখেছে তার মাঝে অনেক হারাম কর্ম ছিল।

অন্যদিকে কেউ কেউ খুব বুজুর্গীর কারণে এমন-সব কাজ থেকেও বিরত থাকে, যা মোটেও হারাম নয়। ফলে দাম্পত্য-জীবন হয়ে যায় নিরস ও বিরক্তিকর। অথচ শরীয়তে শারীরিক মিলনের ক্ষেত্রে বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রী বহুভাবে ও পদ্ধতিতে জায়েযভাবে শারীরিক মিলন করতে পারে। এমনকি মিলনের জন্য কোনো বিশেষ সময়ের আবশ্যিকতা নেই।

---

৪৪. মাসিক আলকাউসার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৬

৪৫. তিরমিযী, হাদীস নং ১১৮৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ২২২৬। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান।

কিন্তু এই সাধারণ বিষয়গুলোও অনেকে জানে না। ফলে দাম্পত্য জীবনের বিপুল সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্যদিকে আরেক দল লোক রয়েছে, যাদের পুরো শারীরিক শিক্ষার মূল কেন্দ্র হচ্ছে পর্ন। এটা এক চরম বাস্তবতা যে আমাদের ভাই-বোনদের এক বিশাল অংশ এই গুনাহে আজ লিপ্ত। অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ ভালো হতে চাচ্ছেন বা হচ্ছেন। এর জন্য তারা হালালভাবে শারীরিক চাহিদা মেটাতে বিয়ে করতে চান। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্ন এডিকশনের ফলে তাদের মাঝে কয়েক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় :

১. তারা বিভিন্ন হারাম পন্থা প্রয়োগ করতে চায়, যেমন এনাল সেক্স (পেছনের রাস্তায় সংগম)। সম্প্রতি আমরা এমন একটি প্র্যাক্টিসিং(!) পরিবারের বিচ্ছেদের ব্যাপারে জেনেছি, যাদের বিচ্ছেদের মূল কারণ হচ্ছে স্বামী এনাল সেক্স করেই ছাড়বে। অথচ শরীয়তে এটা সম্পূর্ণ হারাম। স্ত্রী যতই বাধা দিক স্বামী মানতে নারাজ। ফলে স্ত্রী দ্বীন রক্ষার্থে তালাক নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই অচিন্তনীয় খারাপ চাহিদাটা মনে জন্মাবার কারণ নিঃসন্দে এক সময়ে অতিমাত্রায় পর্ন দেখা। তাই বিয়ের পরও অভ্যাস তো যায়ইনি; বরং পর্নস্টারদের থেকে যেসব জিনিস দেখে সুখ লাভ করত নিজের স্ত্রীর কাছেও এখন সেটাই চাইছে, যা এককথায় অসম্ভব।

মনে রাখতে হবে, পায়ু-গমন বা এনাল সেক্স ইসলামী শরীয়তে অকাট্য হারাম কর্ম। আল্লাহ তাআলা স্ত্রী-গমনের বিধান জানিয়ে বলছেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

'তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের শস্যক্ষেত্র, কাজেই যেদিক দিয়ে ইচ্ছা নিজেদের শস্যক্ষেত্রে গমন করো।'[৪৬]

এই আয়াত থেকে বোঝা গেল, স্ত্রীর সাথে যেকোনো আসনে সহবাস জায়েয, তবে সেটা হতে হবে মাকামুল হারস বা শস্যক্ষেত্রে। আর স্ত্রীর শস্যক্ষেত্র হলো তার যোনি, পায়ুপথে শস্য ফলবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন,

৪৬. সূরা বাকারা, (২) : ২২৩

ملعون من أتى امرأته في دبرها

'যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে মিলিত হয় সে অভিশপ্ত।'[৪৭]

অপর হাদীসে এসেছে,

لَا يَنْظُرُ اللهُ - عز وجل - إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

'আল্লাহ আযযা ওয়া জাললা (কিয়ামতের দিন) ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষ কিংবা কোনো নারীর পশ্চাৎদ্বারে মিলিত হয়।'[৪৮]

এই হাদীসগুলো থেকেও বোঝা যায়, সমকামিতার পাশাপাশি স্বীয় স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে মিলিত হওয়া একটা ভয়ানক মানের কবিরা গুনাহ। কাজেই এ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এটা ওই মানের কবিরা গুনাহ, যা কবিরা গুনাহ হবার ব্যাপারে ইসলামের চার মাযহাবের মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই।

চার মাযহাবের বিধান জানতে দেখুন :

ক. হানাফী মাযহাব :

১. ইমাম তহাবী রহ.-এর মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, ২/৩৪৩

২. ইমাম ইবন নুজাইম রহ.-এর আল বাহরুর রাইক, ৮/২২০

খ. মালিকী মাযহাব :

১. ইমাম ইবনু আবদিল বার রহ.-এর আল কাফী, ২/৫৬৩

২. ইমাম হাত্তাব রহ.-এর মাওয়াহিবুল জালীল, ৫/২৪

গ. শাফেয়ী মাযহাব :

ইমাম নববী রহ.-এর রাওজাতুত তালিবীন, ৭/২০৪

---

৪৭. ইমাম আহমাদ রহ., আল মুসনাদ, হাদীস নং ১০২০৬, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে হাসান।

৪৮. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ১১৭৬, সনদ হাসান।

ঘ. হাম্বলী মাযহাব :

১. ইমাম হাজ্জাউই রহ.-এর আল ইকনা, ৩/২৪০

২. ইমাম বুহুতি রহ.-এর কাশশাফুল কিনা, ৫/১৮৮

এ বিষয়ে ইজমার উল্লেখ করে ইমাম নববী রহ. বলেছেন,

واتفَق العُلَماءُ الذين يُعتَدُّ بهم، على تحريمِ وَطءِ المرأةِ في دُبُرِها حائِضًا كانت أو طاهِرًا

'নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন (ইজমা করেছেন) যে, নারী ঋতুমতী অবস্থায় থাকুক বা পবিত্র অবস্থায় থাকুক, সর্বাবস্থায় তার পশ্চাৎদ্বারে মিলন করা হারাম।'[৪৯]

২. স্ত্রীদের কাছে চাহিদা থাকে তারাও যেন পর্ন মুভির নায়িকাদের মতো সহবাস করে, যা তাদের নেককার স্ত্রীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।

৩. স্ত্রীদের শারীরিক সৌন্দর্য কেমন হবে এই চাহিদাতেও পর্ন এডিকশন প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের লোকেরা স্ত্রীদের কাছ থেকে ওই ধরনের শারীরিক সৌন্দর্য প্রত্যাশা করে, যা নায়িকাদের মতো; কিন্তু এটা তো বাস্তবে সম্ভব নয়। একই রকমভাবে পর্নে আসক্ত নারীরা স্বামীদের সেরকম শারীরিক গঠন আশা করে এবং সেরকম স্ট্যামিনা আশা করে, যা তারা দেখে এসেছে। অথচ এগুলোর কোনোটাই বাস্তবে সম্ভব নয়।

৪. সেক্স টয়ের ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। সেক্স টয় আসলে একটা ব্যাপক বিষয়। এককথায় পুরো হুকুম আলোচনা সম্ভব নয়। আগ্রহী পাঠকদের বলব এ জন্য মুফতী ইবরাহীম বিন আদম আল কাউসারী হাফি.-এর Islamic Guide to Sexual Relations বইটি অবশ্যই পড়ে নেবেন। এর pdf লেখকের অনুমতির কারণে সহজে পাওয়া যায়, ডাউনলোড করে পড়ে নিতে পারেন।[৫০]

এ ছাড়া এর অনুবাদও বাংলায় পাওয়া যায়, যার উল্লেখ বইয়ের শেষে থাকা পাঠসূচিতে দেয়া হয়েছে।

---

৪৯. ইমাম নববী রহ., আল মিনহাজ, ৬/১০

৫০. ডাউনলোড লিঙ্ক : https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Islamic_Guide_To_Sexual_Relations.pdf

এ ধরনের লোকেরা ব্যক্তি-জীবনে ইন্টারনেটকে যেন একপ্রকার টেনে নিয়ে আসেন। ফলে পারিবারিক জীবন জান্নাত হবার জায়গায় জাহান্নাম হয়ে যায়।

এ ছাড়া আরও বহু ধরনের কুকর্মের কথা আমরা বিভিন্ন কেইস থেকে জানতে পেরেছি, যা আপাতত উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি না।

এ জন্য আমাদের পরামর্শ থাকবে অবশ্যই বিয়ের আগে এ ধরনের আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে শতভাগ প্রয়াস যেন করা হয়, প্রয়োজন নিতে হবে মেডিকেল কাউন্সিল।

অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রীর হালাল শারীরিক সম্পর্কের সীমা কতটুকু সেটাও জানতে হবে। এ-সংক্রান্ত কুসংস্কার সম্পর্কে জেনে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। এমনও শুনেছি যে কেউ কেউ মনে করে, সন্তান জন্ম দিতে স্ত্রীর সাথে হায়েজ অবস্থায় মিলিত হতে হয়, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। অথচ এটা সম্পূর্ণ হারাম। কী নিদারুণ অজ্ঞতা!

কাজেই বিয়ের আগে এ-সংক্রান্ত মাসআলা জেনে নিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। আমরা ইনশাআল্লাহ বইয়ের শেষভাগে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের তালিকায় এ-বিষয়ক উত্তম একটি গ্রন্থের নাম জানিয়ে দেব।

এ ছাড়া যখনই শারীরিক সম্পর্কে নতুন এমন কোনো দিক সামনে আসবে যা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়, তখনই লজ্জাকে একপাশে রেখে কোনো অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মুফতীর কাছ থেকে সে-সংক্রান্ত মাসায়েল জেনে নিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন,

وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ

'আর আল্লাহ তাআলা হক জানাতে লজ্জা করেন না।'[৫১]

আমাদেরও হক জানতে গিয়ে লজ্জা করা চলবে না।

৫১. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৩

# অভিজ্ঞদের থেকে পূর্ব-পরামর্শ গ্রহণ

অভিজ্ঞতার দাম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে। এ জন্যই তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অভিজ্ঞ মানুষদের কাছ থেকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। অথচ আমরা এই সত্যটা অনেক সময়ই পাশ কাটিয়ে চলি।

জীবনযুদ্ধে সাফল্য লাভ করা অভিজ্ঞ একজন মানুষ জীবনকে যেভাবে বোঝে, যেভাবে ব্যাখ্যা করে, পথের অলিগলির ঠিকানা যত সহজে জানাতে পারে, অভিজ্ঞতাবিহীন এক মূর্খ তা কখনোই জানাতে পারবে না।

আজকাল অন্য সবকিছুর মতো এ বিষয়েও মানুষ উল্টো পথে চলছে। আমাদের দ্বীনী ভাই-বোনদের তো উচিত ছিল তাদের পরিচিতের মাঝে পারিবারিক জীবনে সফল ও অনুসরণীয়-অনুকরণীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ নেয়া; কিন্তু সেটা না করে তারা সাধারণত নিজেদের বন্ধুবান্ধবীর পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ কীভাবে দেখাবে? তার তো নিজেরই কোনো অভিজ্ঞতা নেই, নেই কোনো জ্ঞান।

এ জন্য দেখা যায় মেয়েরা স্বামীর সাথে কোনো মতানৈক্য হলে যখন বান্ধবীকে সেটা জানায় তখন বান্ধবী বলে, তালাক নিয়ে ফেল, বাপের বাড়ি চলে যা। আবার স্বামী যদি ক্ষুব্ধ হয়ে বন্ধুর কাছে পরামর্শ চায় তখন বন্ধু বলে, ছেড়ে দে বেটা, কত মেয়ে পাবি জীবনে! অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক নয়। এ ছাড়া সমবয়সিদের মাঝে ঈর্ষা ও বদনজর ক্রিয়াশীল থাকে বেশি, এ জন্য সুপরামর্শ কমই পাওয়া যায়।

তাই বিয়ের আগে বিয়ের বিভিন্ন ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে জানতে আপনার

বিশ্বস্ত, দ্বীনদার, আমানতদার ও প্রাজ্ঞ বয়স্কজনের শরণাপন্ন হোন, তাঁর কাছ থেকে সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। যদি তাঁর ৪০ বছরের সংসারের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, তাহলে তাঁর এই অভিজ্ঞতা যোগ করে আপনি ২০ বছর বয়সেই হয়তো ৬০ বছর বয়সির অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে যাবেন।

অনুরূপভাবে কখনো যদি পারিবারিক কলহের উদ্ভব ঘটে, তখনো এ ধরনের প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ নেয়া উচিত, যাচাই-বাছাই করে তা থেকে উত্তম পরামর্শগুলো গ্রহণ করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কেননা তাদের সাথে জেনারেশন গ্যাপ থাকায় ১০০ ভাগ কথা নেবার মতো হয় না। কিছু গ্রহণীয় হয় আর কিছু হয় বর্জনীয়।

## সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যত্র সময়ের অপচয় কমানো

বর্তমানে আমরা ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর সময় অপচয় করে থাকি। বিশেষ করে ফেসবুক তো এখন মহামারির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। একবার নোটিফিকেশন চেক করতে ঢুকলেও দেখা যায় আধা ঘণ্টা অবলীলায় চলে যায়, আমরা টেরও পাই না।

ফলে আমাদের জীবন থেকে প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তির ফলে আমাদের যুব সমাজ থেকে বহু উত্তম গুণ হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন : বই পড়া, পরিবারকে সময় দেয়া, সামাজিকতা, ইবাদতের প্রশান্তি ইত্যাদি।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, একজন যুবক সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ব্যাপকভাবে ইন্টারনেটে যে পরিমাণ সময় অপচয় করে, এই সময়টায় বই পড়লেও অনেক কিছু শিখতে পারত। আর যদি স্কিল ডেভেলপমেন্টে ব্যয় করত, তাহলেও জীবনে কিছু একটা হয়ে ওঠা সহজ হতো। আর অবশ্যই, এই সময়টা ইবাদত করলে যে সওয়াব পাওয়া যেত তা তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের ভাই-বোনেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকহারে আসক্ত। মনে হয় এক মাসও কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে থাকতে নারাজ এবং অক্ষম। অথচ এখনো ব্যক্তি-জীবনে বাহ্যিক সফলতা পাওয়া এমন বহু লোককে দেখতে পাওয়া যায়, যারা পারতপক্ষে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন না কিংবা করলেও খুব নিয়ন্ত্রিত হারে করেন। এর মানে হলো চাইলে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার বাদ দেয়া সম্ভব কিংবা নিদেনপক্ষে ব্যবহার কমানো সম্ভব।

সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব ব্যক্তির পড়াশোনা, চিন্তাধারা, ক্যারিয়ার এসবের ওপর তো পড়েই, এর পাশাপাশি সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি-

জীবনেও পড়ে। বিয়ের আগে থেকেই যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত থাকে, এরা বিয়ের পরও তা ছাড়তে পারে না। ফলে পারিবারিক জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো অনায়াসেই পড়ে। এমনকি বর্তমানে তো অনেক পরিবার কেবল সোশ্যাল মিডিয়া-কেন্দ্রিক মনোমালিন্যের কারণে ভেঙে গিয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সোশ্যাল মিডিয়ার অতি ব্যবহারের কিছু নেতিবাচক প্রভাব যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে বলতে হয় :

১. সোশ্যাল মিডিয়ার অতি ব্যবহার মানুষকে অসামাজিক বানিয়ে ফেলে। ফেসবুকে হাজারো বন্ধু ও ফলোয়ার থাকা ছেলে বা মেয়েটি বাস্তব জীবনে বন্ধু-শূন্যতায় ভোগে। এরা জানে না কীভাবে আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথাবার্তা বলতে হয়, বন্ধুদের সাথে কীভাবে মিশতে হয়। ফলে পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন অশান্তির উদ্ভব ঘটে। দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়া আসক্ত ছেলেটা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে মিশতেই পারছে না। জানে না কীভাবে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। অন্যদিকে মেয়েটাও শ্বশুরবাড়িতে খাপ খাওয়াতে পারছে না। ফলে উভয় পরিবারে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে।

এ জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও মানুষের সাথে মেলামেশার অভ্যাস চালু রাখা প্রয়োজন।

২. যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত তারা পরিবারকে কালেভদ্রে সময় দেয়। ফলে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। দেখা গেল আপনি বাসার বাইরে চাকরি বা ব্যবসায় সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন। রাতে বাড়ি ফেরার পর যদি আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনাসক্ত সাধারণ একজন মানুষ হন, তাহলে নিঃসন্দেহে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের সময় দেবেন। কিন্তু একজন আসক্ত ব্যক্তি বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে বা না হয়ে আগে ফেসবুক খুলে বসে।

কেউ কেউ আবার ভিডিও গেইমস নিয়েও বসে। মোদ্দাকথা, যান্ত্রিক জীবনে ডুব মারে। এদিকে সময় কোন দিক দিয়ে বয়ে চলে যায় টেরও পায় না। যখন সে যন্ত্র থেকে বের হয় ততক্ষণে ঘুমানোর সময়ও অনেকটা পেরিয়ে যায়।

তার ক্ষুব্ধ-বিরক্ত স্ত্রী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়তো নিজেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুব দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিক পারিবারিক সম্পর্ক আর কায়েম থাকে না। এটা

এত কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মাঝেমধ্যেই এ ধরনের অভিযোগ আমাদের সবাইকেই কমবেশি শুনতে হয়।

এই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষণা ইতিমধ্যেই পরিচালিত হয়েছে। যাতে দেখা গিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি সংসার ভাঙার অন্যতম কারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পরকীয়ায় আসক্ত হবার কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল।[৫২]

৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তি ভালো সন্তান-স্বামী-বাবা-মা কিছুই হতে পারে না। কেননা সে তো অপরের হক আদায়ে সময়ই দিতে পারে না, তার অবসর সময়টা সোশ্যাল মিডিয়াই ভোগ করে। এভাবে আমরা আমাদের মাঝে একঝাঁক অকর্মণ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ তৈরি হতে দেখছি।

৪. সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তি একধরনের ঘোরের জগতে থাকে, যা আদৌ বাস্তব নয়। ফলে বাস্তব জীবন সম্পর্কে তার ধারণা বেশ দুর্বল মানের হয়ে থাকে। এই ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগে। যখন কাটে দেখা যায়, সে জীবনের দৌড়ে অনেক বেশিই পিছিয়ে গিয়েছে।

ভেবে দেখুন না, ফেসবুকে থাকলে তো আমাদের মনে হয় দেশের অধিকাংশ মানুষই আজ ইসলাম-বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছে! অথচ এটা অবাস্তব; বরং বাস্তব জীবনে দেখা যায়, মানুষের মাঝে দ্বীন-বিষয়ক অজ্ঞতা এবং ইরতিদাদ বা দ্বীন ত্যাগের ফিতনা মারাত্মক হারে বাড়ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে নিরাপদ রাখুন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া যেসব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার একটা তালিকা Lawrence Robinson and Melinda Smith, M.A. প্রদান করেছেন।[৫৩] আমরা সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি :

১. বাস্তব দুনিয়ার বন্ধুদের চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধুদের সাথে অধিক সময় ব্যয়।

২. সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা অন্যান্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করা, ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া।

---

৫২ Heba Abdallah Mahmoud, et. al. 'The Effect of Social Media on Family Relationships Journal of Nursing and Health Science' (IOSRJNHS), 9(6), 2020, pp. 4757.

৫৩. https://www.helpguide.org/articles/mental-health/social-media-and-mental-health.htm

৩. সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়া।

৪. পড়াশোনা ও অফিসের কাজকর্ম থেকে মানসিকভাবে বিচ্যুত হওয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তি পড়াশোনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। একটু পরপর নোটিফিকেশন চেক করতে মন চায়। ফলে সে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে।

৫. আত্মচিন্তার সময় না পাওয়া; দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে ভাবার সময়-সুযোগ পায় না। সে কী? তার অবস্থা এখন কী? জীবনে তার আর করণীয়ই-বা কী—এসব দেখার ও ভাবার সুযোগ তার থাকে না; সে তো ভার্চুয়াল জীবন নিয়েই ব্যস্ত!

৬. লাইক বা রি-অ্যাকশন পাবার জন্য বিভিন্ন রিস্কি কাজ করা। বিশেষ করে ইসলামী মহলে এর পরিমাণ ভয়ানক রকম বেশি। এর বিভিন্ন ধরন হতে পারে। যেমন : উলামায়ে কেরামকে অহেতুক গালমন্দ করা, ইলমী খেয়ানত করা, যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে পোস্ট ও মন্তব্য করা ইত্যাদি।

৭. ঘুমের সমস্যায় ভোগা। Lawrence Robinson, Melinda Smith, M.A., and Robert Segal, M.A. এর মতে সোশ্যাল মিডিয়া অতি ব্যবহারের ফলে একজন ব্যক্তি নিদ্রাহীনতায় ভুগতে পারে।[৫৪]

প্রিয় পাঠক, আশা করি ওপরের আলোচনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তির কুপ্রভাব আপনি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন । কাজেই বিয়ের আগে থেকেই এর নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হওয়া খুব জরুরি।

বিয়ের পর এই আসক্তি জীবনকে দুর্বিষহ করে দিতে পারে। দেখা যাবে, বিয়ে করলেন এরপর স্ট্যাটাস দিলেন, এরপর সেটার রি-অ্যাকশন আর কমেন্ট দেখতে বারবার ফেসবুকে ঢুকতে থাকলেন। এভাবে বিয়ের দিন থেকেই সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, পাত্রের এহেন ব্যবহারে পাত্রীপক্ষ অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছে। এরপর তো স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো বাদ দিয়ে ফেসবুকে সময় দেবার কথা থাকছেই। এভাবে বিয়ে করেও যেন ব্যক্তি ব্যাচেলর লাইফ কাটাতে চাইছে।

---

৫৪. https://www.helpguide.org/articles/sleep/insomnia-causes-and-cures.htm

মনে রাখতে হবে, ব্যক্তির ওপর স্ত্রীর হক রয়েছে যে, সে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেবে। হাদীসে এসেছে,

وإنَّ لِأَهلِكَ عليكَ حقًّا

'আর নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার পরিবারের (স্ত্রীর) হক রয়েছে।'[৫৫]

তাই বিয়ের আগে থেকেই এই আসক্তি কাটাতে চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যেকোনো আসক্তিই রাতারাতি দূর হয়ে যায় না; বরং ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তা কমাতে হয়।

Lawrence Robinson and Melinda Smith, M.A. এ-বিষয়ক কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা সেগুলো সহজ ভাষায় ও নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছি :

## প্রথম ধাপ : অনলাইনে সময় দেয়া কমানো

২০১৮ সালে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তি দিনে যতক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, তার থেকে যদি মাত্র ৩০ মিনিটও কম ব্যবহার করে, তাহলে তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, হতাশা, একাকিত্ব, ঘুমের সমস্যা এবং fear of missing out অনেকাংশে কমে যায়। এই যে হারিয়ে যাবার ভয় এটা হচ্ছে ওই অনুভূতি—আমি যদি এখানে না থাকি, হারিয়ে যাই, তাহলে কী হবে? একে সংক্ষেপে FOMO বলা হয়। খেয়াল করলে দেখবেন, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে এই সমস্যাগুলোয় আমরা আসলেই ভুগছি।

অনলাইনে সময় দেয়া কমানোর জন্য কিছু কাজ করা যেতে পারে : ১. সোশ্যাল মিডিয়ায় কতটা সময় ব্যয় করছেন তা ট্র্যাক করতে কিছু অ্যাপ পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করে নিজের সময় ব্যয় সম্পর্কে আগে সুনিশ্চিত ধারণা নিন। এরপর একটা টার্গেট ঠিক করুন যে, কতটা সময় আপনি কমাতে চান। নিয়মিত চেক করে দেখুন, টার্গেট পূরণ হচ্ছে কি না।

২. দিনের কিছুটা সময় আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি অফ রাখার অভ্যাস করুন।

৫৫. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ২৪১৩, তাঁর মতে হাসান সহীহ।

যেমন : যখন মিটিংয়ে আছেন, ফ্যামিলি ফাংশনে আছেন, ঘুমাচ্ছেন, ক্লাস করছেন বা করাচ্ছেন—এমন বিভিন্ন সময় আছে যখন ফোন অফ থাকলেও সমস্যা নেই। এই সময়গুলো ফোন অফ রাখার অভ্যাস করুন।

৩. বিছানায় ফোন, ট্যাব কিংবা ল্যাপটপ আনবেন না। বিছানায় বই আনতে পারেন। ঘুমানোর আগে পড়তে পারেন। আর যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন তো স্ত্রী কিংবা স্বামী পাশে থাকবে, তাকে সময় দেবেন, ডিভাইসকে নয়।

৪. সোশ্যাল মিডিয়ার নোটিফিকেশন অফ রাখুন। নোটিফিকেশনের সাউন্ড মনোযোগকে অতিমাত্রায় বিচ্যুত করে। ফলে মানুষ মনোযোগের সাথে কোনো কাজই করতে পারে না। দেখা যায় দুজন মানুষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছে, সে সময় নোটিফিকেশনের সাউন্ড এল, ব্যস আলোচনা রেখে একজন নোটিফিকেশন চেক করতে বসে গেল!

এভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ জন্য নোটিফিকেশন অফ রাখুন বা মিউট করে রাখুন। নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপ যেমন : WhatsApp, Telegram ইত্যাদিতে যদি অফিসিয়াল গ্রুপ বা চ্যাট থাকে, যা না দেখলেই নয়, কেবল সেগুলোর নোটিফিকেশন সাউন্ড অন রাখুন। অফিসের সময়ের বাইরে পারলে সেগুলোও অফ রাখা উচিত।

৫. নোটিফিকেশন বা স্ট্যাটাস চেক করার পরিমাণ কমান। সাধারণত আসক্ত ব্যক্তিরা কয়েক মিনিট পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ট্যাটাস বা নোটিফিকেশন চেক করে থাকে। এই পরিমাণ ধীরে ধীরে কমাতে হবে। প্রথমে ১৫ মিনিট পরপর চেক করবেন। এরপর ৩০ মিনিট পরপর। তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এক ঘণ্টা পরপর। এভাবে টাইম স্প্যান বাড়াতে হবে। এতে সফল হলে ইনশাআল্লাহ একপর্যায়ে আসক্তি কমে আসবে।

৬. মোবাইল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ আন-ইন্সটল করুন। এটা হচ্ছে একদম মোক্ষম অস্ত্র। মোবাইলে ফেসবুক, টুইটার এসব অ্যাপই রাখবেন না। যখন পিসি ব্যবহার করবেন, তখন একটা নির্ধারিত সময়ে এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ করবেন। এটা যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ নিঃসন্দেহে এই আসক্তি কমে যাবে।

## দ্বিতীয় ধাপ : নিজের ফোকাসে পরিবর্তন আনুন

সাধারণত অধিকাংশ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া এমনি এমনি ব্যবহার করে। অর্থাৎ কেন ব্যবহার করে তা নিজেও জানে না। কেউ কেউ একঘেয়েমি কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় লগইন করে। ফলে সময় কোন দিক কেটে যায় তারা টেরও পায় না; এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল স্ক্রল করতে করতে নষ্ট করে ফেলে।

অথচ যদি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে ব্যক্তির নিজস্ব কোনো আলাদা টার্গেট বা ফোকাস থাকে, যেমন : কোনো আলেমের লেখা পড়া, কোনো বিশেষ তথ্য জানা, পরিবারের অমুক-তমুক বা বিশেষ কোনো বন্ধুর সাথে পড়াশোনা নিয়ে কোনো আলাপ করা, ক্লাস নোটিফিকেশন দেখা, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার অনেকটাই সীমিত করা যায়। কেবল নিজের কাজটা করেই বের হয়ে গেলেন, দেখবেন সময়ের অপচয় হবে না ইনশাআল্লাহ।

এ জন্য পরবর্তী সময়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ করবেন, তখন প্রবেশ করার আগে একটু থেমে নিয়ে নিজের মোটিভেশনকে স্পষ্ট করে নেবেন—কেন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে যাচ্ছেন :

১. সোশ্যাল মিডিয়াকে কি আপনি বাস্তব জীবনের প্রতিস্থাপক হিসেবে গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, আপনি কি একাকিত্ব কাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ করতে চান? তাহলে এর চেয়ে ভালো হয় কোনো বন্ধুকে ডেকে নিন, তার সাথে কিছুক্ষণ আড্ডা মারুন। যদি দ্বীনী পোস্ট পড়তে ফেসবুকে প্রবেশ করতে চান, তাহলে এর চেয়ে ভালো হয় কোনো দ্বীনী বই পড়ুন। যদি একঘেয়েমি কাটাতে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে এর চেয়ে ভালো হয় বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসুন, কোনো দোকানে বসে এক কাপ চা খান।

এভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার উত্তম প্রতিস্থাপকগুলো আপনি খুঁজে পাবেন, সেগুলো গ্রহণ করুন।

২. আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকৃটিভ ইউজার নাকি প্যাসিভ ইউজার? যদি প্যাসিভ ইউজার হন তাহলে এটা আপনার জীবনে কোনো উপকার বয়ে আনবে না। আপনি বেহুদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল করে যাবেন, এর পোস্ট পড়বেন, ওর পোস্টে কমেন্ট করবেন, এভাবেই জীবন কেটে যাবে। এর চেয়ে আপনি এক্টিভ ইউজার হন, ভালোভাবে অবদান রাখুন, ভালো লিখুন, ভালো জিনিস শেয়ার করুন, এতে অন্তত জীবনে কিছু অর্জন থাকবে।

৩. সোশ্যাল মিডিয়ার ফলে আপনি কি জীবন নিয়ে হতাশ? সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্নজনের পোস্ট, তাদের ব্যক্তি-জীবন ও ক্যারিয়ারের আলোচনা পড়ে আপনি কি নিজেকে নিয়ে হতাশ? যদি এমন হয় তাহলে নিজের জীবনের প্রাপ্তিগুলো কোথাও লিখে রাখুন, হতাশা আসলে সেগুলো বারবার পড়বেন। কেননা কারও জীবনই প্রাপ্তিশূন্য নয়। এগুলো পড়বেন আর আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, ইনশাআল্লাহ হতাশা কেটে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আরেকটা সুন্দর নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন, সেটা হলো :

انظروا إلى من هو أسفلَ منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقَكم

'যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নে রয়েছে তাদের দিকে লক্ষ করো, যারা তোমাদের চেয়ে উচ্চস্তরে রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ো না।'[৫৬]

এর উপকারিতা হলো, নিম্নস্তরের লোকদের দেখলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কত ভালো রেখেছেন, কত নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুখ থেকে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া বের হবে।

অন্যদিকে উচ্চস্তরের লোকদের দেখলে কেবল না পাওয়ার বেদনা বাড়বে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার ফলে আজকাল প্রদর্শনেচ্ছা এত বেড়েছে যে, কেউ কিছু পেলেই সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেয়। ফলে অন্যরা সেটা দেখে আফসোস করে, হা-হুতাশ করে। এটা পুঁজিবাদের এক নগ্ন থাবা। এ থেকে সতর্ক থাকা জরুরি।

মনে রাখতে হবে, সবকিছু আমার দরকার নাই। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাই যেমনটা দেখায়, বাস্তবে সবাই তেমন হয় না; বরং সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে বাস্তবের পার্থক্য অনেক বেশিই হয়ে থাকে।

তাই হতাশ হবেন না; বরং আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন। আল্লাহ তাআলা শোকরগুজারদের নিয়ামত এমনিতেই বাড়িয়ে দেন।

---

৫৬. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ২৫১৩, সহীহ।

### ধাপ ৩ : অফলাইনের দ্বীনী ভাই ও বন্ধুদের সাথে অধিক সময় ব্যয় করুন

সামনাসামনি অপর মানুষের সোহবত আমাদের অধিক প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়া ভার্চুয়াল সোহবতের ব্যবস্থা করেছে সত্য, কিন্তু তা বাস্তব সাহচর্যের প্রতিস্থাপক নয়।

তাই বাস্তবে বন্ধুদের ও দ্বীনী ভাইদের সাহচর্য অর্জন করা জরুরি। বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের সাহচর্য অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। এ জন্য যা করণীয় :

১. প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক দিন নিজের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কিংবা দ্বীনী ভাইদের সাথে ব্যয় করুন। নিয়মিত আড্ডাবাজি কিন্তু ক্ষতিকর। এটা মাঝেমধ্যে করা উচিত। অথবা কোনো আলেমের সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটান। এ সময় অবশ্যই মোবাইল সাইলেন্ট রাখুন। কোয়ালিটি টাইম কাটান। তবে এ সময় জবানের হেফাজত করা জরুরি; গীবত, শেকায়েত, চোগলখুরি, মিথ্যা বলা ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. কারও কারও অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, অফলাইনে এখন বন্ধুবান্ধব বা দ্বীনী ভাই কেউই নেই, সব অনলাইনে। এমন লোকদের কর্তব্য হলো, পুরাতন ভালো বন্ধু খুঁজে বের করুন, যাকে নক দিলে বিরক্ত হবে না; বরং খুশি হবে ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া আপনার দ্বীন পালনকেও সে ইতিবাচক হিসেবে নেবে। এমন বন্ধুর সাথে এ রকম সময় কাটানো যেতে পারে।

৩. যদি তাও না থাকে তাহলে নতুন বন্ধু বানান। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিসে সর্বত্রই নতুন কারও-না-কারও সাথে বন্ধুত্বের সুযোগ রয়েছে। যাকে দেখে নৈতিক-চারিত্রিক দিক থেকে উন্নত মনে হয়, বা যার সাথে মেলামেশা করা যায় বলে মনে হয়, এমন কোনো সহপাঠী বা সহকর্মীকে নিজেই খাওয়ার দাওয়াত দিন কোনো রেস্টুরেন্টে। ব্যস আস্তে ধীরে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যাবে। তবে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। সময়-সুযোগে সামান্য দ্বীনী দাওয়াতও চালানো যাবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনার মাধ্যমে আপনার নতুন বন্ধুটি পেয়ে যেতে পারে হিদায়াতের দিশা।

### ধাপ ৪ : শোকরগুজার বান্দা হোন

আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তা অনুধাবন করুন, নিজের প্রাপ্তি নিয়ে ভাবুন

আর আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব।'[৫৭]

নিয়ামত বাড়াবার অমোঘ নিয়ম হলো নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। বান্দা যখন শোকরগুজার হয়, হা-হুতাশ করে না তখন আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবার ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি বান্দার শুকরিয়াও আদায় করা জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من لم يشْكُرِ الناسَ لم يشْكُرِ اللهَ

'যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে (আসলে) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।'[৫৮]

এ জন্য আল্লাহর কোনো বান্দা আপনার উপকার করলে অবশ্যই তার শুকরিয়া আদায় করবেন। পারলে হাদিয়া দেবেন, না পারলে অন্তত মৌখিক শুকরিয়া আদায় করবেন। এর পদ্ধতিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। কেউ অনুগ্রহ করলে আমরা তাঁকে বলব, جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন!'[৫৯]

এভাবে আল্লাহ তাআলা, অতঃপর বান্দার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আমরা ভার্চুয়াল বন্দীদশা হতে মুক্তি পাব। খেয়াল করলে দেখা যায় যে, ফেসবুকে আমরা যেভাবে অহরহ একে অপরকে জাযাকাল্লাহু খাইরান বলি, বাস্তব জীবনে এর সিকি পরিমাণও বলা হয় না। অস্বস্তি লাগে, অড ফিল হয়। এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলেই ইনশাআল্লাহ আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি কমাতে সক্ষম হব।

ওপরের এই লম্বা আলোচনার সারকথা হলো, বিয়ের আগে থেকেই সোশ্যাল

---

৫৭. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৭

৫৮. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ১৯৫৫, তাঁর মতে হাসান সহীহ।

৫৯. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ২০৩৫, তাঁর মতে হাসান জায়্যিদ গারীব।

মিডিয়ার আসক্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, পারলে বাদই দিতে হবে; ঘরে বউ রেখে ফেসবুকে কেন থাকবেন?

একই কথা কিন্তু বোনদের জন্যও সত্য। সব দোষ কেবল ভাইদের নয়, বোনদেরও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি রয়েছে। ওপরের অধিকাংশ টিপসই সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে কিছু টিপস কেবল ভাইদের জন্য প্রযোজ্য।

# বিবাহ প্রস্তুতির সারকথা

প্রি-ম্যারেজ প্রস্তুতির বিষয়গুলো আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা মোটাদাগে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি সেগুলো যথাযথ পালনের চেষ্টা করলে আশা করি আপনার বিয়ে-পরবর্তী জীবন সুখকর হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

বিয়ে কোনো জাদুর পরশকাঠি নয় যে, বিয়ে করলেই আপনি সুখের ভেলায় ভাসতে থাকবেন; বরং আপনি নিজেই জাদুর পরশকাঠির চেয়েও রহস্যময় কিছু। মানুষ নিজেই একটি খনিজ সম্পদ। মানুষের ভেতর এমন কিছু দামি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে, যদি সে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে সে সবচেয়ে দামি মানুষ হয়ে যাবে। এ কথাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন,

النَّاسُ مَعَادِنُ

'মানুষ খনিজ সম্পদের মতো।'[৬০]

প্রি-ম্যারেজ যত প্রস্তুতি আছে এর মধ্যে ঈমান-আমলের প্রস্তুতিকেই আমরা সবার আগে এনেছি। কারণ, শুধু বিয়ের ক্ষেত্রেই নয়, দুনিয়া ও আখেরাতের সব ক্ষেত্রেই এ দুটি বিষয় সফলতার মূল চাবিকাঠি।

মানুষের যখন ঈমান-আমল ঠিক থাকবে তখন সে কুঁড়েঘরে না খেয়ে থেকেও অনাবিল শান্তি অনুভব করবে। মাথার ওপরের ভাঙা টিনের ফাঁক গলে পড়া বৃষ্টির পানিকে তার কাছে মনে হবে রহমতের ফল্গুধারা। এক বেলা খাবার পেলে সে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করবে; বাকি দুই বেলা না খেয়ে থাকলেও

৬০. বাইহাকী, হাদীস নং ১০৯৭৪। ইমাম হাকীম রহ. এর মতে সনদ হাসান। মুসতাদরাকে হাকীম, ৩/২৭১, হাদীস নং ৫০৬১।

সে তার রবের দরবারে মাথা ঠেকিয়ে বলবে, ইয়া রব, তুমি আমাকে আজ এক বেলা খেতে দিয়েছ এটাই তো বেশি! কতজন তো এটাও পায় না!

ঈমান-আমল ঠিক থাকলে অটোমেটিক তার ভেতর তাকওয়া চলে আসবে। ফলে শুধু ভুখা-নাঙ্গা স্ত্রী-সন্তানদের মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ পেলেও সে খলিফা উমর ইবনু আব্দিল আজিজ রহ.-এর মতো বলবে, 'আমি চাইলে তোমাদের দেশের সেরা খাবার খাওয়াতে পারতাম; কিন্তু আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি।' একবার তিনি বাসায় ফিরে আঙুর খেতে চাইলেন। বাসা থেকে বলা হলো ঘরে আঙুর নেই আর কোনো পয়সাও নেই যে, কিনে খাওয়া যাবে! খেয়াল করে দেখুন, কথাগুলো বলা হচ্ছে তখন, যখন তিনি পুরো মুসলিম উম্মাহর খলিফাতুল মুসলিমীন। যখন তিনি চাইলে শুধু আঙুর কেন দুনিয়ার তাবৎ দামি খাবারও সামনে উপস্থিত করা তার কাছে নস্যি। তখন তার স্ত্রী একটু কষ্টমাখা সুরেই বললেন, আপনি তো খলিফা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কি একটু আঙুর খাওয়ার জন্যও পয়সা নিতে পারেন না! তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, প্রয়োজনে আমি না খেয়ে থাকব, কিন্তু মুসলিম উম্মাহর আমানতে কোনো খেয়ানত করতে পারব না।

উমর ইবনু আব্দিল আজিজ রহ.-এর স্ত্রীও তাকওয়ার দিক দিয়ে কম ছিলেন না। পুরো পৃথিবী তার মতো আভিজাত্যপূর্ণ মেয়ে খুব কমই দেখেছে, যার বাবা ও মা উভয় দিকের বংশই ছিল বাদশাহ। তার স্বামীও ছিলেন মুসলিম জাহানের অন্যতম বাদশাহ। অথচ স্বামী খলিফাতুল মুসলিমীন হওয়া সত্ত্বেও অভাবের সংসার নিয়ে কখনো তিনি আপত্তি করেননি। এখনকার যুগে তো স্বামীর সামর্থ্য না থাকার পরেও এটা কেন দিল না, ওটা কেন দিল না—এসব আপত্তির ঝড় তোলা হয়; কিন্তু উমর ইবনু আব্দিল আজিজ রহ.-এর স্ত্রী কখনো টুঁ শব্দটিও করেননি।

আচ্ছা এর পেছনে মূল রহস্যটা কী? কী এক মায়ায় পড়ে তারা দুনিয়ার এত নাজ-নিয়ামতকে তুচ্ছ মনে করছেন! কিসের কারণে তারা এত অভাবকে অভাবই মনে করছেন না! এর মূল কারণ হচ্ছে, তাদের ভেতর ঈমানের শিখা সদা ভাস্বর হয়ে ছিল। তাদের কলব আল্লাহ তাআলার ভয় ছেয়ে ছিল, সেখানে আর কারও ভয়ের কোনো স্থান ছিল না। তাদের কলব আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ছিল, সেখানে দুনিয়ার কোনো নাজ-নিয়ামতের আসক্তি জায়গা নেবার সুযোগই ছিল না। ফলে পরিবারের সবাই খাবার না পেয়ে শুধু পেঁয়াজ খেয়ে

থাকলেও কারও মুখে অভিযোগের লেশমাত্র নেই। কেউ রাগ করে বাবার বাড়ি চলে যাচ্ছে না, বা প্রতিমাসে শপিং না হওয়ার কারণে ঘরে ভাঙচুরও করছে না। এর মূল কারণ এটাই—পরিশুদ্ধ ঈমান আর আমল।

তাই বিয়ের পর সংসারে সুখের জোয়ার দেখতে চাইলে বিয়ের আগেই ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করে এরপর প্রস্তুতি নিতে হবে। তাহলে বিয়ের পর স্বামীর অভাবকে তুচ্ছ মনে হবে। কোনোরকম খেয়ে-পরে আমল করে জান্নাতে যাওয়ার প্রতিই মন পড়ে থাকবে।

ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করার আরও একটি কারণ হলো, এতে মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পরকীয়া-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়েছে। বিয়ে-পরবর্তী জীবনেও মানুষ গুনাহ ছাড়তে পারছে না। খুব আগ্রহ দেখিয়ে বিয়ে করলেও বছর পার না হতেই যখন তার ফ্যান্টাসি কেটে যায় তখন স্ত্রীকে মনে হয় পুরোনো কাপড়ের মতো। ফলে ঘরে স্ত্রী থাকার পরও অনেকে বড় বড় গুনাহে জড়িয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেকের সংসারও ভেঙে যায়। অথচ বিয়েকে বলা হয়েছে লজ্জাস্থান হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম। হাদীসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে,

> يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ
>
> 'হে যুবকের দল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন তা করে নেয়। কারণ, বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা যৌন উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখে।'[৬১]

কিন্তু বিয়ের পরেও মানুষ গুনাহ থেকে বাঁচতে না পারার সূক্ষ্ম কারণ এই হাদীসের মধ্যেই বলে দেয়া হয়েছে। হাদীসের মধ্যে যে সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে এটা দ্বারা শুধু শারীরিক প্রস্তুতির কথা বোঝানো হয়নি; বরং ঈমান-আমলের প্রস্তুতি, আর্থিক প্রস্তুতি, মানসিক প্রস্তুতির কথাও বোঝানো হয়েছে। এবং যতদিন পর্যন্ত এ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন না হবে ততদিন কী করণীয় সেটাও

---

৬১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪০০

বলে দেয়া হয়েছে—তাহলে সে যেন রোজা রাখে। কারণ, রোজা তার যৌবনের তাড়নাকে দমিয়ে রাখবে।

এ জন্য বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত রোজা রাখাই কাম্য।

ঈমান-আমলের পরিশুদ্ধতা বিয়ের পর হালাল আয়-রোজগারে বরকত হওয়ারও অন্যতম মাধ্যম। অনেক পরিবারে দেখা যায়, মাসে লাখ টাকা আয় করা সত্ত্বেও যেন কিছুই নেই নেই অবস্থা! মাস শেষে যেন অভাব ফুরোয় না তাদের। আবার অনেক পরিবারে মাসে হাজার দশেক টাকা টেনেটুনে আয় হলেও এটা দিয়েই তাদের সংসার দিব্যি চলে যাচ্ছে। এর মূল রহস্যটা কী?

এর মূল রহস্য হলো, যারা এখনো নিজেদের ঈমান আর আমলকে পরিশুদ্ধ করেনি, তারা দুনিয়ার সমস্ত নাজ-নিয়ামত উপভোগ করতে চায়। তাদের খরচে অপব্যয়ের পরিমাণ থাকে বেশি। কখনো কখনো হারাম পথেও টাকা খরচ হয়। তো তাদের আয়-রোজগারে বরকত হবে কোত্থেকে? উপরন্তু তারা অল্পে তুষ্ট থাকে না। ফলে তাদের আয়-রোজগার যতই বৃদ্ধি পাক, তবুও তাদের অভাব ফুরোয় না।

আর যারা নিজেদের ঈমান-আমলকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে, যারা আখেরাতকে দুনিয়ার আগে রেখেছে, দুনিয়ার প্রতি তাদের কোনো লোভ-লালসা থাকে না। তারা অল্পেতুষ্ট থাকে। ফলে দশ হাজার টাকা দিয়েই তারা পুরো মাস চালিয়ে দেয়। হ্যাঁ, অনেক কিছুই তারা চাইলেই করতে পারে না। কিন্তু তাদের মনে কোনো আফসোস থাকে না। তাদের খরচে অপব্যয়ের কোনো সুযোগ থাকে না। দুনিয়ার সাময়িক কষ্টকে তারা কষ্টই মনে করে না। এমন সংসারে সুখ আসবে না তো কোন সংসারে আসবে!

বিয়ের আগে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হলো, হালাল আয়-রোজগারের পথ চালু করে এরপর বিয়ে করা। এটা আপনার দুনিয়ার স্বার্থে নয়; বরং আখেরাতের স্বার্থেই। সংসারে প্রচণ্ড অভাব থাকলে আপনার আমলে মন বসবে না। নামাজের মধ্যে মাথায় ঘুরতে থাকবে—আজকে তো বাসায় চাল নেই, চালের ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের সময়ও আপনার মাথায় ঘুরতে থাকবে—গত মাসের ভাড়ার টাকা চাইতে আজ বাড়িওয়ালা আসবে, কী বুঝ দেব তাকে! এসব চিন্তা মাথায় আসা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয় বা ঈমানের পরিপন্থী নয়; বরং এটা স্বাভাবিক বিষয়। বিয়ের আগে যারা এসব প্রস্তুতি না নিয়ে বলে, বিয়ে

করলে তো আল্লাহ তাআলা রিযিকে বরকত দেবেন, আর বান্দার রিযিক তো আল্লাহ তাআলার জিম্মায়, এটা নিয়ে আমার এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। দেখা যায় তারাই বিয়ের পর প্রচণ্ড হতাশায় ভোগে, আবার পেছনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তখন যে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।

বিয়ের পর নাহয় দুজন মিলে কষ্ট করে দিনাতিপাত করলেন, কিন্তু দুজনের কোলজুড়ে যখন নতুন মেহমানের আগমন হবে তখন তার খরচের ফিকির তো করতে হবে!

পুরো বইয়ের লেখাকে এক করে যদি বিয়ের প্রস্তুতির কথা বলি, তাহলে এভাবে বলা যায় :

১. নিজের ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করতে হবে। গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। আমল বৃদ্ধি করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

২. কুফু মিলিয়ে বিয়ে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বীনকে আগে রাখতে হবে। নিজের চেয়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে না করাই উচিত। তবে দ্বীনদারীর কারণে করা যেতে পারে।

৩. বিয়ের আগে মানসিকভাবেও প্রস্তুতি নেয়া।

৪. হালাল আয়ের পথ খুলে এরপর বিয়ের পথে পা বাড়ানো। যতটুকু আয় দিয়ে পরিবারকে মধ্যপন্থায় চালানো যাবে ততটুকুই যথেষ্ট।

৫. বিয়ের আগেই প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া। কী কী শব্দ বললে তালাক হয়ে যাবে সেগুলো জেনে নেয়া। এগুলো জানার উদ্দেশ্য তালাক দেয়া নয়; বরং এসব শব্দ থেকে বেঁচে থাকা। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোনো মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া, তিনি পরামর্শ দিলে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিতাবাদিও সংগ্রহ করা।

৬. বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা। আল্লাহ তাআলা যেন সব প্রস্তুতি পূর্ণভাবে নেয়ার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ তাআলা অবিবাহিতদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দ্রুত বিয়ে করার তাওফীক দান করুন। তাদের মনের এতদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা দ্রুত পূরণ করে দিন।

# বিয়ে-বিষয়ক কিছু ফ্যান্টাসি

বইয়ের শুরুতে আমরা বিয়ের পূর্ব-প্রস্তুতি কীভাবে নেয়া উচিত সে সম্পর্কিত বেশকিছু বিষয় আলোচনা করেছি। আমরা এই দাবি করছি না যে, সকল বিষয়ই আলোচিত হয়ে গেছে। তবে আমরা আশাবাদী যে, যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে কেউ যদি তা আমলে নিয়ে বাস্তবায়ন করে, ইনশাআল্লাহ সাফল্য লাভ করবে।

এই পর্বে আমরা বিয়ে-বিষয়ক কিছু ফ্যান্টাসি নিয়ে আলোচনা করব, যা আমাদের মনে শেকর গেড়ে বসেছে। সঠিক মানসিক প্রস্তুতির জন্য এ সকল ফ্যান্টাসির বিষয়ে সতর্ক হওয়া জরুরি।

## ফ্যান্টাসি ১ : বিয়ে করলে সব গুনাহ ছেড়ে দেয়া যাবে

অনেকেই মনে করে থাকেন, বিয়ে করলেই বুঝি সকল গুনাহ আপনাআপনি দূর হয়ে যাবে। পেছনে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, যারা আগে থেকেই গুনাহে অভ্যস্ত, তাকওয়া বৃদ্ধি করতে না পারলে বিয়ের মাধ্যমে আসলে তার গুনাহের পরিমাণ সেভাবে কমে না।

এ প্রসঙ্গে একটা হাদীস উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا تزوَّج العبدُ فقد استكمل نصفَ الدين فليتقِ اللهَ فى النصفِ الباق

'যখন কোনো বান্দা বিয়ে করে তখন সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ

করে ফেলে; কাজেই বাকি অর্ধেকের জন্য সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।'[৬২]

আমরা প্রথমে এই হাদীসের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। মূলত বিয়ে করার মাধ্যমে যে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয়ে যাবার কথা এসেছে, এর মানে এই নয় যে বাস্তবেই অর্ধেক পূরণ হয়ে যায়। কেননা সাধারণভাবেও আমরা জানি যে বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বীনের অর্ধেক তো মোটেও নয়। ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. এর ব্যাখ্যায় মত প্রকাশ করেছেন যে, 'বাক্যে এই আতিশয্য এসেছে মূলত বিয়েকে উৎসাহিত করতে, তা বাস্তবতা বর্ণনা করেনি।'[৬৩]

ইমাম গাযালী রহ. এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'দ্বীনকে নষ্ট করতে যৌনাঙ্গ আর পেট সর্বাধিক প্রভাব রাখে। বিয়ের মাধ্যমে এর একটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; কেননা বিয়ের মাধ্যমে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, কামনা ভেঙে পড়ে, প্রবৃত্তির বিপদকে প্রতিরোধ করা যায়, নজর হেফাজত করা যায় এবং যৌনাঙ্গ হেফাজত করা যায়।'[৬৪]

ইমাম কামালুদ্দীন দামিরী রহ. পেটের বদলে জবানের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।[৬৫]

কাজেই বোঝা গেল যে, বিয়ে করার মাধ্যমে দ্বীনকে হেফাজত করতে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়। কিন্তু এটা গোটা দ্বীনের বিষয় নয়; বরং দ্বীনের একটা অংশবিশেষের ব্যাপারে আলোচনা। উপরন্তু সেটার যে সকল উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোর ওপর আমল করলে, সেগুলো ঠিকমতো পালন করলেই কেবল দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হবে।

কিন্তু আমাদের চিন্তা থাকে উল্টো। আমরা ভাবি বিয়ে এমন এক পরশপাথর, যা পাওয়ামাত্রই আমরা পূতপবিত্র হয়ে যাব। এটা ভুল ধারণা। সাধারণত হুট করে গুনাহের আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না; বরং এর জন্য লাগে নিয়মিত প্রয়াস। আগেকার দিকে সুফীগণ তাঁদের খানকাহে মানুষকে গুনাহ ছাড়াবার

---

৬২. ইমাম বাইহাকী রহ., শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৪৮৬, শায়খ আলবানী রহ.-এর মতে হাসান: সহীহুল জামে, হাদীস নং ৪৩০

৬৩. ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ., মিরকাতুল মাফাতিহ, ৫/২০৪৯

৬৪. প্রাগুক্ত।

৬৫. ইমাম দামিরী রহ., আন নাজমুল ওয়াহহাজ ফি শারহিল মিনহাজ, ৭/৮-৯

জন্য দীর্ঘ সময় ধরে মুজাহাদা করাতেন। আমরা যদি মদ হারাম করার দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখব, আল্লাহ তাআলা ধাপে ধাপে মদকে হারাম করেছেন। কেননা মানবীয় ফিতরাত এমনই—হুট করে আসক্তি ছুটে যায় না।

এ জন্য এই ফ্যান্টাসি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমি বলছি না যে বিয়ে করলে গুনাহ কমবে না। ইনশাআল্লাহ কমবে। কিন্তু আমরা যে হারে কমার আকাঙ্ক্ষা করি সে হারে হয়তো হবে না। এ জন্য যথারীতি তাকওয়া অর্জনের প্রয়াস চালু রাখতে হবে। তাকওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এ জন্য উদ্দিষ্ট হাদীসে আমরা দেখতে পাই, দ্বীনের বাকিটুকুর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকওয়া অবলম্বন করতে বলেছেন। ইমাম তিবী রহ.-এর বক্তব্য মোতাবেক এই যে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হওয়া, এটা মূলত হাদীসের পরের অংশের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ যদি তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করে, তাহলে বিয়ে করার মাধ্যমে দ্বীনের অর্ধেকটা পূরণ হবে, নয়তো হবে না।[৬৬]

সাধারণত বিয়ের পর যেসব গুনাহ কমার জায়গায় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে সে সম্পর্কে উদাহরণ হিসেবে আমরা কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করছি :

**১. গীবত** : স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সুখ-দুঃখের আলাপ করে। কথায় আছে Sharing is caring. শেয়ার না করলেও মুসিবত। কিন্তু দেখা যায় এর মাধ্যমে গীবতের গুনাহ হতেই থাকে। পাশের বাসার অমুক তমুক, অমুক আত্মীয় কিংবা ঘরের ভেতর ঘটা এমন-সব ইস্যু, যা উল্লেখ করা গীবতের আওতায় পড়ে, এসব আলোচনা অহরহ সামনে আসতে থাকে।

ফলে পারস্পরিক গীবতের গুনাহ বাড়তেই থাকে। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক দুঃখ-কষ্ট শেয়ারের সময় অবশ্যই শরয়ী সীমারেখার দিকে লক্ষ রাখবে, যেন গীবত, চোগলখুরি হয়ে না যায়। কখন কখন গীবত জায়েয হয় তা এ সম্পর্কিত বই পড়ে জেনে নেয়া উচিত।

এ জন্য ইমাম নববী রহ.-এর লেখা 'জবানের হেফাজত' বইটি পড়া যেতে পারে; যা বাংলায় অনূদিত হয়েছে, প্রকাশ করেছে মাকতাবাতুন নূর।

---

৬৬. ইমাম আত তিবী রহ., আল কাশিফ আন হাকাইকিস সুনান, ৭/২২৬৬

**২. নারীর প্রতি আকর্ষণ :** এটা সত্য যে বিয়ের ফলে অনেকেই নারীঘটিত গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু অনেকের উল্টো রি-অ্যাকশনও হতে দেখা যায়। যেমন নারীদেহ সম্পর্কে একজন ব্যক্তি একদমই অজ্ঞ। বিয়ের পর যখন সে তা আবিষ্কার করে, তখন তার মাঝে লালসা বৃদ্ধি পায়। আমরা বাস্তবে এমন কেইস পেয়েছি।

এমন হলে হতাশ হবার কিছু নেই; বরং অবশ্যই তাকওয়া বাড়াবার প্রয়াস নিতে হবে, প্রাজ্ঞ উলামার সাথে পরমার্শ করে নিজের অবস্থা উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এ রকম ক্ষেত্রে সম্ভব হলে একাধিক বিয়ে করা যেতে পারে। আর সম্ভব না হলে সবরের বিকল্প নেই।

**৩. নজরের হেফাজত হয় না :** অনেকেই অভিযোগ করেন, বিয়ের পর আর সেভাবে নজরের হেফাজত হচ্ছে না। আগে নারী সত্তাই এমন ছিল যে ফিরেও তাকাতেন না। এখন নারীর মাঝে কী রয়েছে তা আবিষ্কার করেছেন। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদিক-সেদিক চোখ পড়েই যায়।

এ সকল রোগের চিকিৎসাও একটাই—তাকওয়া বাড়ানো। মনের বিরুদ্ধাচরণ করে চোখকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একবার চোখ পড়ে গেলে সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিতে হবে। নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করতে হবে। এটা এমন রোগ, যার ক্ষতিকর প্রভাব ব্যাপক এবং নিরাময় কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে সবই সম্ভব।

**৪. আরও কিছু গুনাহ :** আমরা পেছনে আলোচনা করেছিলাম যে অনেকেই আগে পর্ন এডিক্ট থাকে, এরপর বিয়ে করেও ছাড়তে পারে না। আমরা এমন কেইস পেয়েছি, যেখানে দেখা গিয়েছে স্ত্রী নেককার ছিল, স্বামীও বাহ্যিক দ্বীনদার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পর্নাসক্ত। বিয়ের পর সে নেককার স্ত্রীকেও পর্ন দেখিয়ে দেখিয়ে আসক্ত বানিয়ে ছেড়েছে! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

এগুলো হচ্ছে শয়তানের এমন সব ফাঁদ, যা ছিঁড়ে আসা বাহ্যিকভাবে কঠিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

'নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত বা ছলনা দুর্বল।'[৬৭]

---

৬৭. সূরা নিসা, (৪) : আয়াত ৭৬

কাজেই দৃঢ় মনোবল আর তাকওয়া থাকলে শয়তানের এই জাল ছিঁড়ে বের হওয়া মোটেও কঠিন নয়।

আমরা এই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি এই বাস্তবতাকে সুস্পষ্ট করতে যে, অবশ্যই বিয়ের মাধ্যমে দ্বীনী অবস্থার উন্নয়ন ঘটে, গুনাহের হার কমে, তবে এটা সবার জন্য সত্য নয়; বরং যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে এটা কেবল তার জন্যই সত্য। তাই তাকওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যদি তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ গুনাহ আগে থেকেই কমতে থাকবে। বিয়ে এতে একটা সহায়ক অবস্থান নেবে বা সহায়ক টুল হবে; কিন্তু যদি তাকওয়াই না থাকে, তাহলে বিয়ে হবে গোদের ওপর বিষফোড়া।

## ফ্যান্টাসি ২ : বউ তাহাজ্জুদে উঠিয়ে দেবে

অনেকের মাঝেই এই ভাবনাটা কাজ করে যে বিয়ে করার পর বউ আমাকে তাহাজ্জুদে উঠিয়ে দেবে। এরপর দুজন মিলে তাহাজ্জুদ পড়ব। ভাবনাটা নিঃসন্দেহে ভালো। তবে অকাট্য কোনো বাস্তবতা নয়। আসলে আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে হুট করে তাহাজ্জুদগুজার হওয়া তো সহজ কথা নয়।

এ ছাড়া কেবল বউই কেন উঠিয়ে দেবে? বউয়েরও তো চাহিদা থাকতে পারে যে স্বামী তাকে তাহাজ্জুদে উঠিয়ে দেবে। আমরা তো হাদীসে দেখি যে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তাহাজ্জুদে ডেকে দিতেন, তাঁকে তাঁর স্ত্রীরা ডাকতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন,

> رَحِمَ اللهُ رَجُلا قامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ الله امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.
>
> 'আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই নারীর প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে

এবং নিজ স্বামীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারে।'[৬৮]

এই হাদীস থেকে তো বোঝাই যায় কাজটা আসলে উভয়েরই। স্বামী বা স্ত্রী কারও একক দায়িত্ব নয়। অন্যদিকে কারও যদি পূর্ব অভ্যাস না থাকে, তাহলে এই আমলটা হবে কীভাবে?

দেখা গেল স্বামীরও আগে থেকে তাহাজ্জুদের অভ্যাস নেই, স্ত্রীরও নেই। উভয়ই চায় যেন অপরজন তাকে এতে অভ্যস্ত করে। এভাবে তো আসলে বাস্তবে সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, যদি আগে থেকেই উভয়ের বা কোনো একজনের অন্তত অভ্যাস থাকে, তাহলে অনেকটা সম্ভব। আর বিয়ের পর উভয়ে যদি সমন্বিত প্রয়াস চালায়, তাতেও সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে সেটা হলো, পারিবারিক কাজকর্ম শেষে আমাদের বিছানায় যেতে মানুষের অনেক দেরি হয়ে যায়। এর ওপর যদি শারীরিক মিলন করা হয়, তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নতুন বিয়ে করার পর সাধারণত মিলনের পরিমাণ অনেক দিন পর্যন্ত বেশিই হয়। এরপর একটা স্থিতিশীল অবস্থায় আসে। এই সময়ে এমনও হয় যে ক্লান্তির কারণে ফজরেও মানুষ উঠতে ব্যর্থ হয়, নামাজ কাজা হয়ে যায়।

তাই এই সময়ে দ্রুত বিছানায় যাবার অভ্যাস করা খুবই জরুরি। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তো এমনিতেই রাত বেশ ছোট। এ জন্য চেষ্টা করতে হবে, যেন দ্রুত বিছানায় যাওয়া যায়, পাশাপাশি শক্তিবর্ধক খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আর অ্যালার্ম দেয়া-সহ অন্যান্য পদক্ষেপ সঠিকভাবে নিতে হবে, যেন অন্তত ফরজটা ঠিকমতো আদায় হয়।

যখন অভ্যস্ততা চলে আসবে তখন ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদে উঠাও সহজ হয়ে যাবে। এ জন্য বিয়ের পরপর যদি আমলের ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে ঘাবড়ে যাবেন না। সতর্কতার সাথে না চললে এটা স্বাভাবিক বিষয়।

---

৬৮. ইমাম আবু দাউদ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ১৩০৮, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-মতে সনদ শক্তিশালী।

## ফ্যান্টাসি ৩ : দুজন মিলে অনেক আমল করব

সংসার জীবনটা আসলে একটা জটিল স্থান। আমরা যেভাবে চাই ঠিক সেভাবেই সবকিছু এখানে হয় না। মনের অপছন্দেও অনেক কিছু করা লাগে; এমন অনেক কিছুই আমাদের সাথে ঘটে, যা আমাদের ঠিক ভালো লাগে না।

মানুষ যখন বিয়ে করে ঘরে বউ আনে, আসলে সে তখন পরিবারের ভেতরে একজন বাইরের মানুষকে নিয়ে আসে। এই বাইরের মানুষটা কোনো কোনো পরিবারে কখনোই ভেতরের মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। আবার আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে কোনো কোনো পরিবারে ভেতরের মানুষ হয়ে যায়।

স্ত্রী ঘরে আসার পর থেকে তাকে বহু কাজে জড়িয়ে যেতে হয়। আগে থেকে যেসব ফ্যান্টাসি মনে ছিল—মনের সুখে দুজনে মিলে খুব আমল করব, স্বামী তিলাওয়াত করবে স্ত্রী শুনবে, স্ত্রী তিলাওয়াত করবে স্বামী শুনবে, দুজন মিলে দু-হাত খুলে দান-সদকা করব—এসব অনেক কাজই তখন করা যায় না।

স্বামী-স্ত্রী অনেক বাড়িতে একত্রে খেতেও পারেন না, এক প্লেটে খাওয়া তো দূরের বিষয়। বাড়ির পুরুষরা সেখানে একত্রে খায়, নারীরা একত্রে খায়। পরিবারের কাজের চাপে উভয়ে একসাথে তিলাওয়াত তো দূরের কথা, মেয়েরা অনেক বাড়িতে আওয়াল ওয়াক্তে সালাতও আদায় করতে পারে না। যেসব পরিবারে অন্য মেয়েরা সালাত আদায় করে না, তারা তো হিসেবের বাইরে; যেসব পরিবারে সালাত আদায়ের রেওয়াজ রয়েছে, সেখানেও দেখা যায় বউকে শোনানো হয়—আমরাও তো সালাত আদায় করব। হাতের কাজটা আগে শেষ করো, পরে! আর সালাত আদায়ে একটু বেশি সময় ব্যয় করলে শোনানো হয়—এত্ত সময় লাগে নাকি নামাজ পড়তে? আমরাও তো নামাজ পড়ি!

রাতের সামান্য সময়টুকু ছাড়া স্বামী-স্ত্রীতে একত্র হওয়াই মুশকিল হয়ে যায়। খুনশুটি করলে মুরুব্বিরা বাঁকা চোখে তাকান। এগুলো হচ্ছে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। অনেকেই এমন কিছু বইপত্র লিখেছেন, যেগুলো পড়লে মনে হবে স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর কাজ শুধু আমল আর দুষ্টুমি করা। আসলে বাস্তবতা তো ভিন্ন। সেসব বইয়ে যা লেখা আছে, তা তো একটা মেয়ে নিজের বাপের বাড়িতেই পায় না, অন্যের বাড়িতে কীভাবে পাবে!

বাস্তবতা এটাই যে যৌথ পরিবারে উভয়ের মিলিত সময় পাওয়া কঠিন, সাধারণত

দুপুরের সামান্য ঘুমের সময় আর রাতের সময়টুকু বাদে প্রাইভেসি পাওয়া যায় না। কাজেই ওই যে মিলেমিশে অনেক আমল করা, এটা আসলে সাধারণত হয়ে ওঠে না।

হতাশ হবার কিছু নেই, জীবনটা যেমন জীবনকে সেভাবেই দেখতে শেখায় কল্যাণ রয়েছে। জীবনটা কেবল আমার আর তোমার নয়, আমাদের সকলের— এই চিন্তাটা মাথায় ঢোকানো উচিত।

স্বামী বা স্ত্রী কারও আমলই অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই যদি অপরকে সাথে পাওয়া নাও যায় এতে ক্ষতি নেই, নিজের আমল নিজের মতোই আদায় করে যাওয়া উচিত। বিশেষ করে মেয়েদের। আর সন্তান হওয়ার পর থেকে তো তার দেখাশোনার এক বিশাল দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঁধে চেপে বসবে। তখন এমনিতেও নফল আমলের ওপর খুব প্রভাব পড়ে। কারও তো ফরজ নিয়েও টানাটানি পড়ে যায়।

এগুলো পড়ে হতাশ হলে চলবে না; জীবন এক যুদ্ধের নাম, যুদ্ধের ময়দানে ফুল বর্ষিত হয় না।

## ফ্যান্টাসি ৪ : রিযিক একাই আসতে থাকবে

অনেকে ধরে নিয়েছে যে বিয়ে করলে রিযিক একা একাই আসতে থাকবে। কোনো কাজকর্ম করার দরকার নেই। এ জন্য বিয়ে করতে মন চাইলে বা শারীরিক প্রয়োজন পড়লে পরিবারকে অতিষ্ঠ করে ফেলে, কেউ গোপনে বিয়েটা সেরেও ফেলে। কিন্তু বিয়ে করার পর আর কাজকর্ম কিছুই সে করে না। বেচারা বউ, যে দ্বীনদারী দেখে তাকে বিয়ে করেছিল, দুনিয়াদারির পেরেশানিতে অস্থির হয়ে যায়।

এমন লোক আমরা দেখেছি যারা উপার্জনের কোনো প্রয়াসই নেয় না। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। রিযিক অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকেই আসে, কিন্তু এ জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় করো উত্তম বস্তু, যা তোমরা উপার্জন করেছ।'[৬৯]

এখানে আল্লাহ তাআলা উপার্জনকে ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। দান আল্লাহর তবে উপার্জন ব্যক্তির। এ জন্য উপার্জনের প্রয়াস তো নিতে হবে, এরপর আল্লাহ তাআলা দান করবেন।

খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কত পেশা গ্রহণ করেছেন—বকরি চরিয়েছেন, ব্যবসা করেছেন, কৃষিকর্ম করেছেন আর সেনানায়ক হিসেবেও উপার্জন করেছেন। তাঁর জীবনে তো আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে, আমরা কেন তা বারবার ভুলে যাই?

উপার্জন-বিষয়ক আলোচনা বিবাহ-প্রস্তুতির আলোচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

## ফ্যান্টাসি ৫ : বোনেরা সবাই আয়েশা রাযি.-এর অনুরূপ ব্যবহার আশা করেন

উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে আয়েশা রাযি.-এর ব্যক্তি-জীবন আমাদের কাছে সর্বাধিক বিস্তারিত আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী, অত্যন্ত পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী, যার পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়ে আসমান থেকে আয়াতই নাযিল হয়েছে, সুবহানআল্লাহ! যার ঘরে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী নাযিল হতো। এ জন্য অনেকে তাঁর ঘরকে مهبط الوحي বা ওহীর অবতরণস্থল অভিধায় ভূষিত করেছেন।[৭০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর; বাড়িতে তুলে আনেন নয় বছর বয়সে, আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।[৭১] অর্থাৎ যে বয়সে আজকাল অনেকের বিয়েও হয় না, সে বয়সে তিনি বিধবা হয়ে যান।

---

৬৯. সূরা বাকারা, (২) : ২৬৭

৭০. আহমাদ মাহমুদ শুওয়াবিকাহ, আল আসারুস সামিন ফি নুসরাতি আইশাতা উম্মিল মুমিনীন, পৃষ্ঠা ১০৪

৭১. ইমাম মুসলিম রহ., আস সহীহ, হাদীস নং ১৪২২

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫২ বছর, যে বয়সের একজন ব্যক্তিকে আমাদের দ্বীনী বোনেরা কেউ বিয়ে করবেন কি না আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আর অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কারও তুলনা চলে না।

অথচ আমাদের বোনেরা চান, তাঁদের স্বামীরা তাঁদের সাথে ঠিক সে ব্যবহারই করুক, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযি.-এর সাথে করতেন!

ঠিক আছে, এ থেকে উৎসাহ নেয়া যায়, কিন্তু ফ্যান্টাসি পোষণ করা যায় না। কেননা আয়েশা রাযি.-এর বয়স তো অনেক কম ছিল। এত অল্প বয়সে একজন কিশোরীর যেমন মানসিকতা থাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক বয়স্ক হওয়ায় ছিলেন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। একজন কিশোরীকে যে রকম ভালোবাসা ও সঙ্গ তিনি দিতে পেরেছেন, তেমন প্রজ্ঞা ও ধৈর্য আমরা ২৫-৩০ বছরের যুবকের কাছে আশাও করতে পারি না।

অন্যদিকে অন্যান্য উম্মুল মুমিনীন, যাদের বয়স তুলনামূলক বেশি ছিল, তাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যবহার করতে দেখা যায় না। এ থেকে তো বোঝাই যায় যে, আয়েশা রাযি.-এর অত্যধিক কম বয়সের কারণে তিনি তাঁকে এ রকম মূল্যায়ন করতেন।

এই বাস্তবতাটা আমাদের অনেক বোনের চোখ এড়িয়ে যায়। ফলে তারা নিজেরা হয়তো ২৫ বছর বয়স পার করছেন, অথচ ৩০ বছর বয়সি স্বামীর কাছে আশা করছেন যে, তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সেই ব্যবহার করুক যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৪ বছর বয়সে ৯ বছর বয়সি স্ত্রীর সাথে করেছেন, কিংবা ৬১ বছর বয়সে ১৬ বছর বয়সি স্ত্রীর সাথে করেছেন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এই দিকগুলো থেকে নেবার মতো অনেক শিক্ষা রয়েছে। যেমন :

১. স্ত্রীর মন রক্ষা করা।

২. স্ত্রীর বয়স অনুপাতে ব্যবহার করা।

৩. স্ত্রীকে সহায়তা করা।

৪. স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা।

৫. স্ত্রীর সাথে দুষ্টুমি করা ইত্যাদি।

এ ধরনের শিক্ষাগুলো নিয়ে জীবনে আমল করা উচিত। একটা সুখী পরিবার গঠনে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তবে এসব ঘটনা থেকে ফ্যান্টাসিতে পড়া যাবে না। এমন মনে করা যাবে না যে, আমিও শিশুতোষ আচরণ করব আর আমার স্বামীও তাতে সায় দেবে; যদি না দেয় তাহলে সে খারাপ মানুষ। বিষয়টা এমন নয়।

একেক মানুষের একেক ধরনের চাহিদা থাকে। কোনো স্বামী স্ত্রীর শিশুতোষ আচরণ পছন্দ করে, কেউ চায় প্রাপ্তবয়স্ক আচরণ, কেউ চায় দায়িত্বশীলতা, কেউ চায় ব্যাপক রোমান্টিকতা। অন্যদিকে সংসারের দায়িত্ব আর চাপগুলোও তো রয়েছে।

সে জন্য আমরা বলব যে, স্বামীর সাথে মেলবন্ধন তৈরি করা জরুরি। উভয়ের কমন পছন্দগুলোর ব্যাপারে একমত হন, আর যেগুলো মেলে না সেগুলো নিয়ে উভয়পক্ষ একধরনের সমঝোতায় পৌঁছান। সাংসারিক জীবন হচ্ছে একটা সমঝোতা চুক্তির নাম। মোহর থেকে এই সমঝোতা শুরু হয়। যদি টিকে থাকে তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত সমঝোতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এই সমঝোতা যত পার্ফেক্ট হবে পারিবারিক জীবন তত সুখের হবে। অন্যদিকে ওভার এস্টিমেশন ও অতি চাহিদা জীবনকে পর্যুদস্ত করে দেবে।

## ফ্যান্টাসি ৬ : দ্বীনী পারিবারিক জীবন এমন সুখী হবে যে, কোনো দুঃখই আর থাকবে না

অনেকে মনে করেন, বিয়ে করলে বুঝি জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তারা ভাবেন, একজন দ্বীনদার স্বামী বা স্ত্রী পেলে জীবনের আর কোনো চাওয়া থাকে না, কেবল সুখ আর সুখ, কোনো দুঃখ নেই। এরপর যখন পারিবারিক জীবনের ধাক্কাগুলো খাওয়া শুরু করেন তখন ভেঙে পড়েন।

এ ধরনের চিন্তার কিছু ত্রুটি আমরা আলোচনা করছি :

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দ্বীনদার হলেই যে সংসার শতভাগ সুখী হবে এমনটা শতভাগ সত্য নয়। যায়েদ রাযি. আর যাইনাব রাযি. দুজনই জলীলুল কদর সাহাবী ছিলেন, তাঁদের বিয়ে খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন; কিন্তু পারিবারিক জীবনে উভয়ে সুখী হননি বিধায় আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেন।

আসমা রাযি. এবং যুবায়ের বিন আওয়াম রাযি. এর সংসারেও কিছু অশান্তি ছিল। যুবায়ের রাযি. ছিলেন জান্নাতী ১০ সাহাবীর একজন, অন্যদিকে আসমা রাযি. ছিলেন আবু বকর রাযি.-এর মেয়ে, আয়েশা রাযি.-এর সৎ-বোন। এমন পবিত্র জুটিতে ভাঙন হলো কেন তাহলে?

আসলে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। অবশ্যই দ্বীনদারী তার মাঝে অন্যতম একটি, কিন্তু এটাই সব নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শতভাগ দ্বীনদার হলেও বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মনোমালিন্য হতে পারে। জীবনটা তো মাসআলা-নির্ভর নয়। যারা ইসলামী আইন-কানুন, মাসআলা-মাসায়েল ১০০% মেনে চলে, তাঁদের আমরা শতভাগ দ্বীনদার বলতে পারি। কিন্তু পারিবারিক জীবন মাসআলার চেয়ে ইহসানের ওপর অধিক নির্ভর করে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যত ইহসান করবে, জীবন তত সুখের হবে। ধর্মীয় আইন-কানুন উভয়ের হক আদায়ের জন্য রক্ষাকবচ-স্বরূপ; পারস্পরিক ইহসান ঠিকমতো না থাকলে মাসআলা দিয়ে সংসার ধরে রাখা যায় না।

২. জীবন কেবল দুজন মানুষের সম্পর্কের নাম নয়। দেখা গেল স্বামী-স্ত্রীতে খুব সুন্দর সম্পর্ক, কিন্তু :

ক. পরিবারে আর্থিক টানাপোড়েন এত বেশি যে মানসিকভাবে স্থিতিশীল থাকা কঠিন।

খ. শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ প্রমুখের সাথে স্ত্রীর বনিবনা হয় না, সারাদিন বাসায় সংঘাত চলছে, স্বামীরও সেই পরিমাণ সামর্থ্য, সাহস বা ইচ্ছা নেই যে স্ত্রীকে রক্ষা করবে কিংবা বিকল্প ভাববে। বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ তো আমাদের সমাজের চিরায়ত ঐতিহ্য। এই লড়াই সংসারের সকল সুখ নষ্ট করে দেয়।[৭২]

---

৭২. বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক নিয়ে নানা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানতে পড়তে পারেন উমেদ প্রকাশের 'অন্দরমহল' বইটি।

গ. আত্মীয়দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক বিরোধ, আছে খোঁটা দেয়া, তুচ্ছতাচ্ছিল্যকরণ।

এ সকল অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকলেও পরিবারে সুখ তেমন থাকে না। জীবনটা অনেক ক্ষেত্রে রোবটিক হয়ে যায়।

এ জন্য এ রকম ফ্যান্টাসি মনে রাখবেন না যে, স্বামী-স্ত্রী দ্বীনদার হলে চারিদিকে কেবল সুখ আর সুখ। এটা তো জীবনের একটা দিক মাত্র। উভয়ে দ্বীনদার হওয়ায় এই দিকটায় অবশ্যই সুখ পাবেন; কিন্তু জীবনের আরও ৯৯টা দিক রয়েছে, সেগুলোতে সুখ পেতে হলে সেগুলোও তো ভালো হওয়া লাগবে। পরীক্ষায় সাবজেক্ট আছে ১২টা, একটায় পাশ করলেন মানে একটাতেই পাশ করলেন; কিছু সাবজেক্টে মিল থাকায় এই প্রস্তুতি দিয়ে আরও কয়েকটা সাবজেক্টে কিছুটা সুবিধা হলো। কিন্তু বাকিগুলো ঠিকমতো পাশ না করলে কি আর পুরো পাশ করবেন?

একই রকম জীবনযুদ্ধের অনেকগুলো ফ্রন্ট। একেক ফ্রন্টের একেক রূপ, একেক রকম লড়াই। আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে এগিয়ে যেতে হবে। কোনোভাবেই ভেঙে পড়া যাবে না। মনে রাখবেন, নির্ভেজাল ও শতভাগ পার্ফেক্ট সুখ কেবল জান্নাতে পাওয়া যাবে।

তবে স্বামী-স্ত্রীতে ভালো সমঝোতা ও মিল-মহব্বত থাকলে একটা সুবিধা তো আছেই, সেটা হলো নিজেদের কষ্টগুলো একে অপরের সাথে শেয়ার করতে পারা। এটা এক বিশাল নিয়ামত, যার তুলনা হয় না। দেখবেন জীবনের অনেক কষ্ট এর মাধ্যমে সহনীয় হয়ে যাবে। কষ্ট হবে না এমন না, কষ্ট হবে, তবে সয়ে যাওয়া যাবে। এটাও কম কী?

## ফ্যান্টাসি ৭ : দুজন মিলে ২৪x৭ রোম্যান্টিক থাকব

যৌবনের সূচনায় মানুষের মাঝে রোমান্টিসিজমের ঢেউ এমনিতেই উথলে ওঠে। মনে মনে কত স্বপ্ন বোনা হয় তার তো শেষ নেই। মনে হয় একবার বিয়ে করে নিই, বউয়ের সাথে বা স্বামীর সাথে তো প্রতিদিনই ২৪ ঘণ্টা কেবল রোমান্টিসিজমই করব।

কিন্তু বিয়ের পর দেখা যায় চিত্র তো ভিন্ন! ফজরের সালাত আদায়ের পর থেকে বাসার কাজ সামলানো, শাশুড়ি, ননদ প্রভৃতির সাথে সময় কাটানো, দিনশেষে রাতে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় যাওয়া।

আর স্বামী, তারই-বা এত সুখ কোথায়? সারাদিন উপার্জনের পেছনে ছোটা, দিনশেষে ক্লাস হয়ে ঘরে ফেরা। সপ্তাহে এক দিন থাকে ছুটি। সেদিনটাও পরিবারের কত কাজ, আত্মীয়দের সাথে দেখা করা ইত্যাদি।

এভাবেই তো জীবনের বড় একটা অংশ কেটে যায়। সংসারে নিজেদের কথা চালাতে চালাতে বয়স পৌঁছে যায় ৪০ এর কোঠায়। তখন আর কিসের রোমান্টিসিজম!

যৌথ পরিবারে চাইলেও অনেক কিছু করা যায় না। সকাল সকাল মন চাইলেও বউকে আদর করা যায় না। মায়ের কাছে বসে থাকা বউকে ডেকে আনা যায় না। রাতবিরেতে সব সময় গোসলও করা যায় না। মন চাইলেই বউকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যায় না, ট্যুর দেয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে তো স্বপ্ন-বিলাস।

এসবই জীবনের কড়া বাস্তবতা। আমরা ছুটে পালাতে চাইলেও এগুলো আমাদের থেকে পালাবে এর নিশ্চয়তা নেই, আমাদেরও সেভাবে পালাতে দেবে বলে মনে হয় না। এ জন্য দরকার, আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেয়া।

আমরা ২৪ ঘণ্টা রোমান্স করব এই নিয়ত বাদ দিয়ে নিয়ত করুন, আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের সুযোগ দেবেন তখনই রোমান্স করব; যতটা সুযোগ দেবেন ততটা করব, এবং এর জন্য শোকরগুজার হব। যা পাইনি তা ভেবে হা-হুতাশ করব না। অমুক-তমুকের ফেসবুক-ইন্সটাগ্রাম পোস্ট দেখে হতাশ হব না।

এটুকু যদি সঠিকভাবে আমল করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ ধাক্কা খাবেন না; বরং সহজেই সামলে উঠবেন। যদি অপ্রত্যাশিতভাবে বেশি প্রাপ্তি ঘটে তখন খুশি হয়ে যাবেন।

অধিক চাহিদা থাকার পর না পেয়ে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে চাহিদা কম রাখা ভালো। তখন অল্প পেলেও ভালো লাগে। আর যদি চাহিদার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়, তাহলে তো আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়। আমাদের দ্বীন তো এ জন্যই কানাআত বা অল্পেতুষ্টি শেখায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ

'আর তুমি অল্পে তুষ্ট হও, তাহলে লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞ হতে পারবে।'[৭৩]

## ফ্যান্টাসি ৮ : আমার স্বামী বা স্ত্রী হবে ওলী-আল্লাহ কিংবা অমুক-তমুকের মতো

সবাই চায় তার স্বামী বা স্ত্রী হবে এককথায় আল্লাহর ওলী। তার মাঝে কোনো গুনাহ, ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারবে না।

একবার তো এক বোন বিধান জানতে চাইলেন, তার স্বামী দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী নন, তিনি কি তালাক নিতে পারেন?

জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি সালাত আদায় করেন না?

বললেন, হ্যাঁ করেন।

—তিনি কি দাড়ি রাখেন না? পর্দা মানেন না?

—এগুলো সবই করেন।

—তাহলে তার সমস্যা কী?

—তিনি দ্বীন শিখতে কোর্স করতে আগ্রহী নন!

হতভম্ব হয়ে গেলাম! এটা কোনো ওজর হলো!

কিন্তু এই ঘটনাটা একটা বাস্তবতা শেখায়, তা হলো, অনেক ভাই-বোন তার কাউন্টার পার্টকে রীতিমতো মাসুম হওয়ার শর্ত দিয়ে থাকেন! অথচ এটা তো কেবল নবীরাই হন (আলাইহিমুস সালাম)। সাধারণ কোনো ওলীও গুনাহ হতে মুক্ত থাকেন না। হ্যাঁ, যত বিলায়াত বাড়ে গুনাহের পরিমাণ তত কমে। ব্যস, এটুকুই, গুনাহমুক্ত কেউই হয় না। এটা নবীদের গুণ, নবী ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে গুনাহমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

---

৭৩. ইমাম ইবনু মাজাহ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ৪২১৭, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে হাসান।

এ রকম অনেক কেইসই আমাদের সামনে আসে, আমরা তখন দুঃখ পাই। মানুষের চিন্তাভাবনা কী বিচিত্র লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে!

অনেক সময় মানুষ Comparison এ আক্রান্ত হয়। তাদের মনে হয় আমার বউটা অমুক-তমুকের মতো হতে হবে, বা অমুকের বউ এমন হতে পারলে আমার বউ কেন পারবে না! অন্যদিকে স্ত্রীরা ভাবে আমার স্বামী অমুক-তমুকের মতো হতে হবে, বা অমুকের স্বামী এমন হতে পারলে আমার স্বামী কেন পারবে না!

এই ধরনের তুলনা আমাদের অভিভাবকদের মাঝে দেখা যায়, অমুকের ছেলে বা মেয়ে এত ব্রিলিয়ান্ট, এই করেছে, সেই করেছে—এসব বলে তারা সন্তানদের মানসিকভাবে টর্চার করেন। একই সমস্যা আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দেখি।

**প্রথমত,** মনে রাখতে হবে, আপনার স্বামী বা স্ত্রী অমুক বা তমুক নয়। দুটি মানুষের মানসিকতা, চিন্তা-চেতনায় স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য থাকবে। প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মেনে নেয়া শিখতে হবে। আপনার আজকে অমুকের স্বামী-স্ত্রী বা তমুক সেলিব্রেটিকে দেখে ভালো লাগছে, আপনি আপনার স্বামী বা স্ত্রীকে বাধ্য করলেন কিছুটা তার মতো হতে, এতে করে সে নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাবে। সে আর সে থাকবে না, অন্য কেউ হয়ে যাবে। ফলে তার জীবনের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত হবে, আপনার সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারবে না।

**দ্বিতীয়ত,** কাল যখন অন্য কাউকে দেখে আপনার আরও ভালো মনে হবে, আপনি তখন তাকে আরেকজনের মতো হতে বলবেন। এভাবে এক ধারাবাহিকতা শুরু হবে, যার শেষ নেই। ফলে ব্যক্তি-জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে।

**তৃতীয়ত,** যারা এরকম তুলনামূলক বিশ্লেষণ চালায়, তাদের যদি তাদের স্বামী বা স্ত্রী একই রকম এপ্রোচে অন্য কারও মতো হতে বলে, তাহলে সাধারণত তারা এটা মানতে পারে না, এটা তাদের ভালো লাগে না। তাহলে বোঝা গেল, বিষয়টা প্রকৃতপক্ষেই ভালো নয়। যেটা নিজের জন্য পছন্দ করি না সেটা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া তো সঠিক নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না

তার ভাইয়ের জন্য সেই জিনিসটা পছন্দ করছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।'[৭৪]

এখান থেকে যে মূলনীতিটা বোঝা যায় তা হলো, নিজের জন্য যা পছন্দ অপরের জন্য তা পছন্দ করা উচিত; নিজের জন্য যা অপছন্দ অপরের জন্য তা পছন্দ করা বা অপরকে তা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। আমরা সবাই যদি ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই মূলনীতির প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হই, তাহলে পরিবার, সমাজ ও দেশ অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

তাই তুলনা বাদ দিন, পেছনে যেমন বলে এসেছি তেমন করে একটা সুন্দর সমঝোতামূলক জীবন গঠন করুন। একে অপরের জন্য স্যাক্রিফাইস করতে শিখুন, তাহলে জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠবে।

যেসব বাবা-মা অপরের সন্তান কী করেছে না করেছে তা ভেবে নিজের সন্তানদের কষ্ট দেয়, তারা যেমন জীবনে সুখী হতে পারে না, সর্বদা বিষণ্ণতায় ভোগে; তেমনি যে স্বামী বা স্ত্রী অপরের স্বামী বা স্ত্রী কী করেছে না করেছে ভেবে কষ্ট পায়, তারাও জীবনে সুখী হতে পারে না, সর্বদা বিষণ্ণতায় ভোগে।

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে, স্বতন্ত্র রুচি-সৌন্দর্য ও অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য; এই সৌন্দর্যকে নষ্ট না করে, বিগড়ে না দিয়ে, পরিবর্তন না করে, উপভোগ করতে শেখার মাঝেই প্রকৃত সাফল্য।

## ফ্যান্টাসি ৯ : আমি একাধিক বিয়ে করব

ইসলামী শরীয়ত পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ের বিধান রেখেছে। কারও প্রয়োজন হলে ও সামর্থ্য থাকলে সে একত্রে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখতে পারে। এটা সত্য, কিন্তু আমাদের দেশে এর তেমন প্রয়োগ নেই।

এমতাবস্থায় আমাদের অনেক ভাই কষ্টকল্পনা করে যে, তারা চারটা বিয়ে করবে। অথচ দেখা গেল তার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামর্থ্যই নেই। অনেকের তো এক বিয়েরও সামর্থ্য নেই!

---

৭৪. ইমাম বুখারী রহ., আস সহীহ, হাদীস নং ১৩

যদি সামর্থ্য থাকে, পরিবারে মানানো যায়, তাহলে এগুতে দোষ নেই; কিন্তু সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও ফ্যান্টাসিতে ভোগা অনুচিত, এতে বিদ্যমান পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেকে এটাই বোঝেন না যে, একাধিক বিয়ে করতে হলে কেবল নিজে আর একজন পাত্রী রাজি হয়ে গেলেই হবে না; নিজের পরিবার আর ওই পাত্রীর পরিবারকেও রাজি করাতে হবে, যা আমাদের দেশে অনেকটা অসম্ভব। এ দেশে তো আলেম পরিবারের আলেম সদস্যও একাধিক বিয়ে করতে গিয়ে গোপনে করতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানে জেনারেল পরিবার থেকে সম্মতির আশা কতটাই-বা করা যায়?

এর ফলে যা হয় তা হলো, অনেকেই গোপনে বিয়ে করেন, এরপর সেই স্ত্রীর হক আদায় করেন না। কেউ আবার যখন মন চায় ওই বউকে তালাক দিয়ে দেয়। কেননা সরকারি রেজিস্ট্রেশন করা না থাকায় সেই বউ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে না। এর ফলে কত যে জুলুম হচ্ছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

২য়, ৩য় বা ৪র্থ বিয়েটা গোপনে করে রেজিস্ট্রেশন না করার মানে হচ্ছে, স্বামী মারা যাবার পর এই স্ত্রীরা তার আইনত ওয়ারিস হতে সক্ষম হয় না। ফলে সে এবং তার সন্তানাদি এক অকূল পাথারে পড়ে। তাই একাধিক বিয়ে করার আগে সবদিক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হক আদায় করে, পরিবারকে রাজি করিয়ে আদৌ বিয়ে করতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

অনেকের তো একাধিক বিয়ের সামর্থ্য নেই কিন্তু খায়েশ আছে, আর এই খায়েশের জন্য সে স্ত্রীকে জ্বালাতন করে, মানসিক অত্যাচার চালায়। বারবার মাসনার কথা বলে, অথচ মাসনার সামর্থ্য নেই।

সামর্থ্য না থাকলে অহেতুক কষ্ট দেবার মানে হয় না। একধরনের অসুস্থতা রয়েছে, যাকে বলা হয় প্যানিক এটাক। মেয়েরা এতে আক্রান্ত হয় বেশি। এতে একজন মানুষ মারাও যেতে পারে।

পরিবারে অহেতুক মাসনা মাসনা করে স্ত্রীকে প্যানিক এটাকে আক্রান্ত করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন, এমন ঘটনার নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে।

একাধিক বিয়ে করা একটা নেক কাজ, যদি সকল শর্ত পূরণ করে করা হয়। কিন্তু যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অহেতুক এই প্রসঙ্গ তুলে স্ত্রীকে মানসিক কষ্ট দেয়া অনুচিত।

এমনিতেও জুমহুর উলামা এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকাকে মুস্তাহাব বলেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন রহ. বলেছেন,

الاقتصار على الواحدة أسلم

'এক স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ থাকা সর্বাধিক নিরাপদ।'[৭৫]

ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাতে রয়েছে, 'যদি ব্যক্তির একজন স্ত্রী থাকে আর সে এরপর আরও বিয়ে করতে চায়, এ ক্ষেত্রে যদি তার আশঙ্কা হয় যে সে তাদের মাঝে সমতাবিধান করতে পারবে না, তাহলে সে বিয়ে করবে না। আর যদি এই আশঙ্কা না থাকে, তাহলে বিয়ে করতে পারে। তবে একাধিক বিয়ে থেকে বিরত থাকাই উত্তম। সে ক্ষেত্রে (একাধিক বিয়ে না করায়) স্ত্রীকে দুঃখ দেয়া থেকে বিরত থাকার বিনিময় বা সওয়াব সে পাবে।'[৭৬]

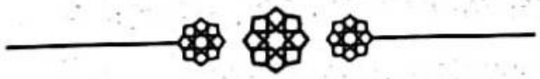

৭৫. শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন রহ., শারহুল মুমতি, ১২/১২

৭৬. আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, ১/৩৪১; ড. আলী ওয়ানিস, তুআদ্দিদুয যাওজাত, পৃষ্ঠা ৫

# পারিবারিক কলহ সমাধানের উপায়

আমাদের এই বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—ফ্যান্টাসি বাদ দিয়ে বাস্তবতার নিরিখে বিয়ের প্রস্তুতি।

আমাদের মূল আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ সমাপ্ত হয়েছে। বিবাহিত জীবনের বিষয়গুলো আমাদের এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে গুরুত্ব বিবেচনা করে পারিবারিক কলহ সমাধানের উপায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আমরা করব। কেননা কলহ এমন বিষয়, যা সব পরিবারেই কমবেশি থাকে। যদি সমাধা করা যায় তাহলে জীবনের অনেক পেরেশানিই দূর হয়ে যায়, কিন্তু সমাধান করা না গেলে পারিবারিক কলহ জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে।

এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তু মুফতী তাকী উসমানী হাফি.-এর গ্রন্থ 'ইসলাম আওর হামারী যিন্দেগীর' ৫ম খণ্ড হতে নেয়া, যা বাংলায় 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন' নামে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ সেখান থেকে বিস্তারিত আলোচনা পড়ে নিতে পারেন। কেবল মূল থিম অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা পয়েন্ট বৃদ্ধি করেছি এবং আলোচনাও সংক্ষিপ্ত করে এখানে উপস্থাপন করছি :

**১. পারস্পরিক মিল-মহব্বত সৃষ্টি করা :** পারস্পরিক মিল-মহব্বত থাকলে কলহ এমনিতেও জন্ম নেয় না, যদি কখনো কলহ দেখা দেয়ও, সমাধান করে নেয়া অনেক সহজ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিজ্ঞেস করলেন,

ألا أخبِرُكُم بأفضَلَ من درجةِ الصِّيامِ والصَّلاةِ والصَّدَقَة؟

'মর্যাদার দিক থেকে রোজা, সালাম ও সদকার চেয়েও কোন আমলটি উত্তম আমি কি তোমাদের তা জানাব না?'

সাহাবীরা রাযি. বললেন, 'অবশ্যই জানাবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ।'

তিনি বললেন,

إصلاحُ ذاتِ البَينِ، وفسادُ ذات البين الحالِقَة

'আপসে মিল-মীমাংসা করা। আর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ হলো ধ্বংসাত্মক।'[৭৭]

সুতরাং বোঝা গেল, পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি করার ফজিলত অত্যন্ত বেশি। এটা করা গেলে পারিবারিক কলহ এমনিতেও দূর হয়ে যায়। অন্যদিকে ঝগড়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে, কেননা তা ধ্বংসাত্মক বিষয়।

ঝগড়া ত্যাগের ফজিলত এত বেশি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أنا زعِيم بِبيتٍ في رَبَضِ الجنةِ، لمن ترك المِراء وإن كان مُحِقًّا

'যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া ছেড়ে দেয়, আমি তার জন্য মধ্যজান্নাতে একটি মহলের দায়িত্ব নিচ্ছি।'[৭৮]

তবে এই ভালোবাসা তৈরি করতে কিছু জিনিস প্রতিবন্ধক। যথা :

—অহংকার।

—উচ্চাশা।

—স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করার প্রবণতা না থাকা।

—স্বার্থপরতা।

—দ্বিমুখী নীতি।

---

৭৭. ইমাম আবু দাউদ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ৪৯১৯, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে সহীহ।

৭৮. ইমাম আবু দাউদ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ৪৮০০, আল্লামা শুআইব আরনাউত রহ.-এর মতে হাসান।

এগুলো যদি পরিহার করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ পারস্পরিক ভালোবাসা সহজেই তৈরি করা যাবে।

**২. ধৈর্য ও সহনশীলতা :** দুনিয়ার জীবনে আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত যা ঘটে তার সব আমাদের পছন্দনীয় হয় না। এই অপছন্দনীয় বিষয়গুলোতে ধৈর্যধারণের সওয়াব অনেক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> المسلِمُ إذا كانَ مخالطًا النَّاسَ ويصبِرُ على أذاهم خيرٌ منَ المسلمِ الَّذي لا يخالطُ النَّاسَ ولا يصبرُ على أذاهم
>
> 'যে মুসলিম মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবর করে, সে ওই মুসলিমের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে সবরও করে না।'[৭৯]

কাজেই পারিবারিক কলহে ধৈর্যধারণ করতে পারলে আমরা অবশ্যই উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হব।

এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

> لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ
>
> 'কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। সে যদি তার কোনো একটা আচরণ অপছন্দ করেও, অপর কোনো আচরণে ঠিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'[৮০]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে কোনো আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে স্ত্রীকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, দেখা যাবে তার অপর আচরণ ভালো।[৮১] এটা বিপরীতক্রমেও সঠিক। অর্থাৎ স্বামীর কোনো একটা দিক খারাপ লাগলেই তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়, হয়তো তার অন্যান্য দিকগুলো সুন্দর।

---

৭৯. ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ২৫০৯; ইমাম ইবনু মাজাহ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ৪০৩২, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ.-এর মতে হাসান; ফাতহুল বারী, ১০/৫১২

৮০. ইমাম মুসলিম রহ., আস সহীহ, হাদীস নং ১৪৬৯

৮১. ইমাম নববী রহ., আল মিনহাজ শরহু সহিহি মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ: ১০/৫৮

তাই পারস্পরিক মনোমালিন্যে সবর করুন। সবরের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা বেহিসাব দান করবেন। যদি আমরা পারস্পরিক কলহে সবর করতে সক্ষম হই, তাহলে ইনশাআল্লাহ কলহ-বিবাদ একা একাই থেমে যাবে।

**৩. ক্ষমা ও উদারতা:** সবরের সাথে ক্ষমা সম্পৃক্ত। ক্ষমা করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সবরই হয়ে ওঠে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৮২]

মুমিনদের জন্য তো ওপরের আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট, যেখানে ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমা করার বিনিময় হিসেবে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কলহে যদি ক্ষমার চর্চা করা যায়, ইনশাআল্লাহ কলহ কখনোই আর ভয়ানক রূপ লাভ করবে না।

**৪. লেনদেনের স্বচ্ছতা :** পারিবারিক কলহে লেনদেনের অস্বচ্ছতাও বড় ভূমিকা রাখে। লেনদেনের অস্বচ্ছতা তো এমন রোগ, যাতে আমরা সবাই কমবেশি আক্রান্ত, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

পারিবারিক পরিবেশে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তিতে ভুগি, অথচ মনে ঠিকই খচখচ করে। স্বামী স্ত্রীর কাছে প্রয়োজনীয় হিসাব তলব করতে অস্বস্তি বোধ করে, স্ত্রীর অর্থ স্বামীর কাছে থেকে থাকলে সেও হিসাব চাইতে অস্বস্তি বোধ করে। পরে যখন প্রকৃতপক্ষেই হিসাবে গড়মিল ধরা পড়ে, কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

এ জন্য শরীয়াহ আমাদের একটি মূলনীতি শিখিয়ে দিয়েছে—'তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকো এবং লেনদেন করো অপরিচিতের মতো।'

---

৮২ সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৩৩-৩৪

এভাবে যদি লেনদেনে স্বচ্ছতা রাখা যায়, তাহলে ব্যক্তি-জীবনে অনেক দিকের পেরেশানি থেকে আগে থেকেই বেঁচে থাকা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

**৫. তর্ক-বিতর্ক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ পরিহার :** পরিবারে কলহের অন্যতম কারণ হলো একে অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। অথচ এর কোনোটাই সঠিক কাজ নয়।

একটি হাদীসে রয়েছে,

لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَه

> 'তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে বাদানুবাদ কোরো না, তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কোরো না এবং এমন কোনো ওয়াদা তার সাথে কোরো না, যা তুমি পরে ভঙ্গ করবে।'[৮৩]

এখান থেকে কয়েকটা জিনিস শেখা যায় :

১. অহেতুক বাদানুবাদ না করা।

২. ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা।

৩. ভঙ্গ করার নিয়তে ওয়াদা না করা বা এমন ওয়াদা না করা, যা রাখতে পারবে না এটা আগে থেকেই জানা আছে।

দেখা যায় সামাজিক জীবনের মতো পারিবারিক জীবনেও এই বিষয়গুলো কলহের ইন্ধন জোগায়। অহেতুক বাদানুবাদ থেকে ঝগড়া একপর্যায়ে তালাকে গড়ায়; একে অপরের পরিবার, পড়াশোনা, সৌন্দর্য, দ্বীন-পালন ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা করার ফলে এমন ঝগড়া লাগে যে, শেষ পর্যন্ত সংসার ভাঙার দশা হয়! আর বউকে করা ওয়াদা ভাঙাকে অনেকে তো বীর পুরুষের লক্ষণ বলে মনে করে, কেউ আবার মজা নেয়। বউকে অহেতুক রাগাবেন না। অহেতুক রাগাতে থাকলে একপর্যায়ে সে এমন ক্ষুব্ধ হবে যে, সম্পর্ককে আর স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা সম্ভব নাও হতে পারে।

এই রোগগুলো থেকে যদি বেঁচে থাকা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ পারিবারিক কলহ অনেক কমে যাবে।

---

৮৩. ইমাম বুখারী রহ., আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৩৯৪; ইমাম তিরমিযী রহ., আস সুনান, হাদীস নং ১৯৯৫, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রহ.-এর মতে যইফ; বুলুগুল মারাম, হাদীস নং ১৫১২

৬. **মিথ্যা পরিহার :** মিথ্যা এমনিতেই অনেক বড় গুনাহ, আমরা সবাই তা জানি কিন্তু এই মিথ্যা যদি এমন কারও সাথে বলা হয় যে আপনাকে বিশ্বাস করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তা আরও বড় গুনাহ এবং এতে মিথ্যা বলার পাশাপাশি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধও যুক্ত হয়।

এক হাদীসে রয়েছে,

كَبُرَت خيانةً أن تُحَدِّثَ أخاكَ حديثاً هو لَكَ به مُصَدِّقٌ، وأنتَ لَهُ به كاذِبٌ.

'সবচাইতে খিয়ানত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইকে এমন কিছু বললে, যা সে সত্য বলে মনে করল, অথচ এ ব্যাপারে তুমি তার সাথে মিথ্যা বলেছ!'[৮৪]

পারিবারিক জীবনে এই হাদীসের প্রভাব অপরিসীম। স্বামী-স্ত্রী এমন দুজন সত্তা, যারা সর্বাধিক আপন। শারীরিক ও মানসিকভাবে এতটা আপন দুনিয়ার অন্য কেউ হয় না। তারা একে অপরকে বিশ্বাস করে, একে অপরের ওপর আস্থা রাখে।

অথচ দেখা যায় একে অপরের কাছে মিথ্যা বলে, স্বামী বা স্ত্রী যে-ই বিশ্বাস ভঙ্গ করে মিথ্যা বলুক না কেন, অপরপক্ষ তা সত্য বলেই সরল মনে মেনে নেয়। অপরে সত্যটা যদি নাও বোঝে, নাও জানে, আল্লাহ তাআলা তো জানেন। তাঁর দরবারে তো খিয়ানতকারী হিসেবে নাম উঠে গেল, সে খেয়াল কি আমাদের আছে?

অনেককে বলতে শুনেছি যে, স্ত্রী বা স্বামীর কাছে সব সত্য বলতে নেই। যদি স্বামী বা স্ত্রী আপনার জীবনের সব সত্য জানার অধিকার না রাখে, তাহলে আর কে রাখবে?

অবশ্য এমন ধারণা তৈরির পেছনে কখনো উভয়ের বা কোনো এক পক্ষের ব্যবহারে মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি ও অহেতুক সন্দেহ দায়ী হয়ে থাকে। তাই উভয়কে এসব বিষয়ে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এত কড়াকড়ি করা উচিত নয় যে, পারস্পরিক সততাই হুমকির মুখে পড়ে। অন্যদিকে অহেতুক সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৮৪. ইমাম আবু দাউদ রহ., আস সুনান, হাদীস নং ৪৯৭১, আল্লামা আহমাদ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ.-এর মতে সহীহ; আল মুদাউই লি ইলালিল জামিয়িস সাগীর ওয়া শারহিল মুনাউই, ৫/১৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

'হে মুমিনগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাকো; কারণ, অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কোরো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কোরো না।'[৮৫]

এ জন্য অহেতুক সন্দেহ পরিত্যাজ্য। যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সঠিকভাবে থাকে, তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের প্রয়োজনই পড়বে না। অবশ্য একজন কড়াকড়ি করে বলে আরেকজনের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয হয়ে যায় না।

যাই হোক, সবশেষে এটুকুই বলব, একজন মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, আমি কি চোখ বুজে তাকে মিথ্যা বলতে পারি? নিজের পরিবারের কাছে যে সৎ হতে পারে না, সে আর কোথায় সৎ হবে?

এমন না যে কেবল স্বামীরাই মিথ্যা বলে, স্ত্রীরাও বলে। উভয়পক্ষ হতেই মিথ্যা পরিত্যাজ্য। পৃথিবীর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ হালাল সম্পর্কটিতে হারামের কালিমা লেপনের চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ কমই আছে।

যদি মিথ্যা পরিত্যাগ করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ পারিবারিক কলহ অনেকাংশেই কমে যাবে।

**৭. একে অপরের মানসিক অবস্থা বোঝা :** সুন্দর পারিবারিক জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের মানসিক অবস্থা বোঝা খুব জরুরি। আমি আমার স্ত্রী বা স্বামীকে কীভাবে মেন্টাল সাপোর্ট দিতে চাই এটা বোঝার চেয়ে অধিক জরুরি হলো, সে কেমন মেন্টাল সাপোর্টের আশা করে বা তার কোন ধরনের মেন্টাল সাপোর্ট দরকার সেটা বোঝা। এই বিষয়টা অনেকেই বোঝে না, ফলে ভালো করতে গিয়ে খারাপও হয়ে যায়।

যেমন কেউ কেউ আছে যারা মানসিক অস্থিরতায় স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে সান্ত্বনা শুনতে চায়। তখন তার পাশে থাকলে, দুটো সান্ত্বনার কথা বললে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে বা বুকে জড়িয়ে রাখলে মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করে।

---

৮৫. সূরা হুজুরাত, (৩৯) : ১২

অন্যদিকে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা স্ট্রেসে থাকলে বা মানসিক কোনো অস্থিরতায় ভুগলে সান্ত্বনা-বাণী শুনতে পছন্দ করে না, এ ধরনের মানুষকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দিতে হয়। দেখা যায় কিছুক্ষণ একাকী কাটালে তারা শান্ত হয়ে যায়। শান্ত হয়ে যাবার পর তাদের সান্ত্বনা দিলে তা গ্রহণ করতে পারে। তারা তখন উৎফুল্ল হয়ে যায়।

ওপরের দুটা সিনারিও উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে, মানুষের অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে। সবাই এক মানসিকতার হয় না। এ জন্য আপনার স্বামী বা স্ত্রীর মানসিকতাটা বিয়ের শুরুর দিকে ধীরে ধীরে বুঝে নিতে হবে এবং সে মোতাবেক তাকে সাহচর্য দিতে হবে। অনেকেই এটা বুঝতে চায় না; বরং নিজের যেমন ভালো লাগে অপরের সাথে তেমনই আচরণ করতে চায় ও করতে যায়। ফলে এ থেকে অনেক সময় কলহের সূত্রপাত ঘটে।

অন্যদিকে মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন প্রাকৃতিকভাবেই তারা খিটখিটে মেজাজে থাকে। এ সময়টা সয়ে যেতে হয়। যেমন মেয়েদের পিরিয়ড চলাকালে তারা অস্বস্তিতে ভোগে, মানসিকভাবে অস্থির হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এ সময় তাদের দেয়া কষ্টগুলো হজম করে ফেলতে হয়। কেননা, এ সময় তাদের যে হালত, এটা আল্লাহ-প্রদত্ত।

এ ছাড়া মুড সুইং কেবল যে মেয়েদের হয় তা না, ছেলেদেরও হয়। মেয়েদের তুলনামূলক বেশি হয়। অনেকে এটাকে মিথ মনে করেন, তবে এটা আসলেই বাস্তব। ব্রিটিশ জার্নাল অভ সাইক্রিয়াট্রির একটি সংখ্যা বলছে, Mood instability is a common, clinically important phenomenon, with functional consequences.

'মুডের অস্থিতিশীলতা একটি কমন ও চিকিৎসাগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার ক্রিয়ামূলক প্রভাব রয়েছে।'[৮৬]

মুড সুইংয়ের সময়টা একে অপরকে ভালোমতো বোঝা দরকার, একে অপরকে সহানুভূতির সাথে সহায়তা করা দরকার। আমাদের বাপ-দাদাদের এমন হতো না বা মা-নানিদের হতো না, এসব কথা বলা ও ভাবা অনুচিত। কেননা তাদেরও

৮৬. Broome MR, Saunders KE, Harrison PJ, Marwaha S. Mood instability: significance, definition and measurement. Br J Psychiatry. 2015; 207(4): 283-285. doi: 10.1192/bjp.bp.114.158543

হতো, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে আগের দিনের মানুষের জ্ঞান কম থাকায় তারা এসব বিষয়কে সঠিকভাবে ডিল করতে পারতেন না। আলহামদুলিল্লাহ, সময়ের সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান বেড়েছে, এখন এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এসব সমস্যাকে সঠিকভাবে ডিল করার মাঝেই কল্যাণ।

ওপরে যে সাতটি টিপস দেয়া হলো তার ওপর যদি সঠিকভাবে স্বামী-স্ত্রী আমল করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তারা কলহমুক্ত পরিবার গড়ে সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সে তাওফীক দান করুন, আমীন।

# উপসংহার

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির মধ্যে সর্বপ্রথম যে সম্পর্কটি সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক ও সমব্যথী। দাম্পত্য-সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا

'যেন তুমি তার মাঝে প্রশান্তি লাভ করতে পারো।'[৮৭]

এই মহৎ উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়ে যায় সঠিক প্রস্তুতির অভাবে এবং কিছু ফ্যান্টাসির কারণে। অথচ বাস্তবতা বুঝে সঠিক ও উপযুক্ত প্রস্তুতি নিলে ইনশাআল্লাহ বিবাহিত জীবন হবে সুখের নীড় এবং আনন্দঘন এক ঠিকানা। সেখানে অর্জিত হবে প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি। তখন আর বাড়ির বাইরে ভালো লাগবে না, অবসর সময়টা বাসায় নিজের পরিবারের কাছেই কাটাতে মন চাইবে।

অন্যদিকে সঠিক প্রস্তুতিবিহীন একটা বিয়ে জীবনে অনেক পেরেশানি বয়ে আনে। ফলে অনেকে নিজ পরিবারের কাছেই ফেরারি হয়ে যায়, অবসর সময়টা হাটে-বাজারে ঘুরে নষ্ট করে, বাসায় ফিরতে ভয় হয়, যেন নিজের কাছ থেকে নিজেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনেরা, যারা বিবাহিত জীবনের স্বপ্নে এখন বিভোর, তাদের স্বপ্নটা যেন ভেঙে না যায়, দুঃস্বপ্নে যেন পরিণত না হয়, সে জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। যেন শুরু থেকেই স্বপ্নটা সঠিক ও যথাযথ হয়, অহেতুক স্বপ্ন না হয়, সেটাই আমাদের কামনা। এ. পি. জে. আবুল কালাম বলেছিলেন,

৮৭. সূরা রুম, (৩০) : ২১

Dream is not that which you see while sleeping.

'স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো।'

আমাদের স্বপ্নটা দেখতে হবে জেগে জেগে, সঠিকভাবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কী স্বপ্ন দেখব তার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; কিন্তু জেগে জেগে আমি কী স্বপ্ন দেখব সেটা আমি নিজেই ঠিক করতে পারি।

এই বইয়ের আলোকে যদি আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনেরা তাদের স্বপ্নের প্যাটার্নটা সঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে সক্ষম হন, তাহলে আমাদের প্রয়াস সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

মেয়েটির বয়স এখনো ১৮ পেরোয়নি, তবে দ্বীন পালনের চেষ্টা করে। হিজাব-নিকাব সব আমলই চলছে। পারিবারিক পরিবেশও বেশ সহায়ক। ব্যবসায়ী বাবা অমত তো করেনইনি; বরং সমর্থন ও সাহায্য করে গেছেন। ফেসবুকে তার প্রোফাইলে রয়েছে বিভিন্ন দ্বীনী পোস্ট। সে নিজের স্বপ্নের কথা লিখেছে সেখানে—স্বামীর সাথে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়বে, দুজনে একসাথে দ্বীন পালন করবে, দ্বীন শিখবে, একে অপরের সহধর্মী ও সহমর্মী হবে।

কিন্তু বিয়ের পরে দেখা দিল ভিন্ন পরিস্থিতি...

স্পিডব্রেকারের কাজ কি মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছতে বাধা দেয়া? কক্ষনো না। স্পিডব্রেকার তো মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। বাধনহারা গতি যেন বিপদ ডেকে না আনে সে জন্য। সুস্থভাবে যেন স্বজনের কাছে সবাই ফিরতে পারে সে জন্য। 'বিয়ের আগে' বইটাও তেমনই এক স্পিডব্রেকার। এর উদ্দেশ্য কখনোই বিয়েকে বাধাগ্রস্ত করা, বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা নয়।

'বিয়ের আগে' বইটির উদ্দেশ্য, বুঝেশুঝে বিয়েতে উৎসাহিত করা। পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে বিয়ে করতে বলা। সঠিকভাবে সঠিক মানুষকে বিয়ে করতে বলা। কারণ? কারণ, আমরা অসংখ্য অপরিণামদর্শী বিয়ে দেখেছি। কত দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সেসব বাঁধন, যা সৃষ্টি হয়েছিল ফ্যান্টাসির ভিতে ভর করে।

আর তেমনটা না হোক। বিয়েকে কেউ ছেলেখেলা না ভাবুক। তরুণ-তরুণীরা বিয়ের আগেই বিয়ের বাস্তবতাগুলো বুঝে নিক, প্রস্তুত হোক, বিয়ে করুক। অতঃপর সুখে-শান্তিতে দুনিয়া-আখিরাতে একত্রে বসবাস করুক। আল্লাহুম্মা আমীন।

Edited by
T.me/Abdullah_2325